ডাইরি

নটরাজন

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৩৬৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

সুন্দর লাক্সারি কোচ্-খানা টুরিস্টলজের সামনে এসে দাঁড়াতেই যাত্রীদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। যাক, খুব একটা দেরি হয়নি তা'হলে। মাত্র পনেরো মিনিট। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা একটানা চলার পথে এই পনেরো মিনিট দেরি কিছুই নয়।

বাসখানা থামতেই দরজা খুলে নেমে এলো বাইশ-তেইশ বছরের একটি গাড়োয়ালী যুবক। ছিপছিপে চেহারা। ফর্সা গায়ের রং। ঈষৎ কটা চটি চোখ, গায়ে টেরিকটের ফুল সার্ট, পরনে ফুলপ্যান্ট। মাথায় একটা টুরিস্ট-টুপি। কাঁধে ঝোলানো একটা মোটা হাতেবোনা সোয়েটার, যা নাকি হিমালয়ের হাই অল্‌টিচুডে দরকার হয়।

যুবকটি কয়েক পা এগিয়ে এসে অপেক্ষমান যাত্রীদের উদ্দেশে নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, গুড্‌মর্নিং লেডিজ এণ্ড জেন্টেলমেন। তারপর হিন্দিতে বলতে থাকে, আপনাদের এই শুভযাত্রায় কোম্পানীর তরফে আপনাদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। আজ থেকে সাতদিন আপনাদের গাইড্ হিসেবে আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবো। আপনারা আমাকে ডাকবেন 'নটিয়াল' বলে।

একটু থেমে নটিয়াল উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীদের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার বললে, চেহারায় মালুম হচ্ছে এই ট্রিপের যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই কলকাতার মানুষ। বাঙ্গালীরা তো মছ্-লি-ভাত পছন্দ্ করে। লেকিন উই আর ভোর সরি। আমাদের এই ট্যুরে আমরা যেখানে যেখানে থামবো সেখানে কোথাও ঐ জিনিস পাওয়া যাবে না। এদিকের পাহাড়ী অঞ্চলে সবাই ভেজিটেরিয়ান। কিন্তু আমি কোসিস্ করবো কোথাও কোথাও আপনাদের জন্যে গোশ্ত-ভাতের ব্যবস্থা করতে। তবে মছ্‌লি কোথাও মিলবে না। কথার শেষে যুবক নটিয়াল একটু হেসে সামনে দাঁড়ানো পরিতোষের দিকে তাকাতেই পরিতোষও হেসে বাঙ্গালী উচ্চারণে হিন্দিতে বললে, কোই বাত নেহি, নটিয়াল। হামলোগ ভি ভেজিটেরিয়ান বন্‌নে কে লিয়ে বিলকুল তৈয়ার হ্যায়। পরিতোষের কথায় উপস্থিত মেয়ে-পুরুষেরা অনেকেই হেসে সমর্থন করে তাকে।

জায়গাটার নাম মুনি-কি-রেতি। ঋষিকেশ সহরের মধ্যে এই জায়গাতেই গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ-নিগমের টুরিস্ট লজ। উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটা সংস্থা এটা। প্রায় সারা বছর ধরেই নিজেদের লাক্সারি বাসে এরা হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থ ইত্যাদিতে যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে। হিমালয়ের ছোট-বড় জনপদে রয়েছে এদের নিজস্ব টুরিস্ট লজ। সেখানেই রাতে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। পরের দিন আবার যাত্রা শুরু।

যাত্রীদের ছোট-বড় অনেক দল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের দল যেমনি আছে, তেমনি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গোটা পরিবারের দলও রয়েছে। কারুর ইচ্ছা হিমালয়ের তীর্থদর্শন, কারুর বা স্রেফ হিমালয় ভ্রমণ। তীর্থদর্শন কেবল ফাউ। বন্ধু-বান্ধবের দলও রয়েছে কয়েকটা।

পরিতোষেরা দলে মোট তিনজন। স্ত্রী বনানী ও ভাগ্নে সঞ্জয়। মামা-ভাগ্নের বয়সের তফাৎ আট-দশ বছরের হলেও দু'জনের দারুণ মনের মিল। পরিতোষের দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে বসে হিমালয় ভ্রমণ তথা তীর্থদর্শনের প্রস্তাব দিতে গিয়ে সঞ্জয় একদিন বলেছিল, জানো ছোটমামা, অনেকদিন ধরে হিমালয়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে। কিন্তু লেখা-পড়ার জন্যেই যাওয়া হয়নি। এখন যখন ঐ পাট শেষ হয়েছে, তখন চলো না একবার ঐ দিকটায় ঘুরে আসি।

—কোথায় যেতে চাস্? জিজ্ঞেস করেছিল পরিতোষ।

জবাব দিয়েছিল সঞ্জয়, কেদার-বদ্রী চলো। দশ-বারো দিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

—দিল্লিতে তোকে কবে জয়েন করতে হবে?

একটু ভেবে বলেছিল সঞ্জয়, তার দেরি আছে।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে পরিতোষ আবার বলেছিল, কথাটা অবশ্যি মন্দ বলিস্‌নি। আমারও কেমন একঘেয়ে লাগছে এখানে। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে এবারের বাজেটের পর থেকেই লোহার বাজার বড়ই ওঠানামা করছে। এরকম মওকায়ই তো টু-পাইস কামিয়ে নিতে হয়। তাই এই সময় কলকাতা ছেড়ে—

—রাখো তো তোমার টু-পাইসের ধান্ধা, বলে উঠেছিল সঞ্জয়, বাজেট তো প্রতি বছরই হবে। আর তোমাদের লোহা-লক্কড়ের দামের ওঠানামাও চিরকাল থাকবে। কিন্তু আমাদের তিনজনের একসঙ্গে হিমালয়ে বেড়ানোর সুযোগ আবার কবে পাওয়া যাবে কে জানে? তাই বলছিলাম—

একটু সময় চিন্তা করে পরিতোষ। তারপর বলেছিল, দাঁড়া, একবার আমার মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি।

—মন্ত্রী? বিস্মিত কণ্ঠস্বর সঞ্জয়ের, ও—ছোটমামীর কথা বলছো?

জবাব দিয়েছিল পবিতোষ, সে ছাড়া আর কে? আমার মন্ত্রী বলিস্, সেনাপতি বলিস্, সবই তো তোর ঐ ছোটমামী। কথার শেষে হেসে উঠেছিল পবিতোষ।

সঞ্জয়ও হেসে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, মন্ত্রী না হয় বুঝলাম। তোমার মন্ত্রণাদাতা সে। কিন্তু সেনাপতির ব্যাপারটা কি?

—বাঃ, তা বুঝি জানিস না? বলেছিল পবিতোষ, সম্বৎসর চাঁদার উৎপাত থেকে তোর ঐ ছোটমামীই তো আমাকে রক্ষা করে। কোত্থেকে যেন আট দশখানা চাঁদার বই জোগাড় করে নিজের কাছে সযত্নে রেখে দিয়েছে। চাঁদাওয়ালারা এলেই হাসিমুখে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, ও, তোমরা এসে পড়েছ? কি শীতলাপুজোর চাঁদা তো? ভালই হয়েছে। আমিও ভেবেছিলাম তোমাদের কাছেই যাবো। তা ভাই, আমাকে কত দিতে হবে? তোর মামীর কথাবার্তায় প্রথমে ভড়কে যায় মা-শীতলার চ্যালারা। ভিড়ের মধ্য থেকে হয়তো একজন বলে ওঠে, তা মাসীমা, আপনার কাছ থেকে আমরা এবার পঁচিশ টাকা চাইবো। সঙ্গে সঙ্গে তোর মামী জবাব দেয়, বটেই তো, যে বাজার তাতে এর কমে হবে কেন? বলেই ঘরে গিয়ে পঁচিশ টাকা ও তার নিজস্ব একখানা চাঁদার বই এনে বলে, আর পারি না বাপু, সংসার দেখবো, না চাঁদা আদায় করে বেড়াবো? তা ভাই তোমাদের নামে কত চাঁদা লিখবো? শেষ পর্যন্ত অবশ্যি তোর মামীকে আর চাঁদার রসিদ কাটতে হয় না। পাঁচিশ টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা দিয়েই ব্যাপারটা মিটে যায়। কেবল কি তাই? পুরানো খবরের কাগজওয়ালাদের জোচ্চুরি থেকে আমাকে বাঁচাতে তোর মামী নিজেই একজোড়া দাঁড়িপাল্লা কিনে ফেলেছে।

পবিতোষের কথায় সঞ্জয় হেসে উঠেছিল। পবিতোষ চেঁচিয়ে ডেকেছিল স্ত্রীকে, ও—নানী, নানী, একবার এই ঘরে এসো তো। দেখ এসে সঞ্জু কি বলছে। স্ত্রীকে 'নানী' অর্থাৎ দিদিমা বলে সম্বোধন করে খেপানোর ব্যাপারটা অজানা ছিল না সঞ্জয়ের। তাই সে কিছু না বলে কেবল মুখটিপে হাসছিল।

শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকেছিল বনানী। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম কোপে সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, আবার তুমি আমাকে ঐ নামে ডাকছো? আচ্ছা তুমি কি? তোমার কি একটু লজ্জা-সরমও নেই? নিজের ছোট ভাগ্নের সামনে বসে আমাকে ঐ নানী-নানী বলে ঠাট্টা করছো?

—বারে? যেন আকাশ থেকে পড়েছিল পবিতোষ, আমি আবার তোমাকে

কখন ঠাট্টা করলাম? তুমি আমার সাতপাকে বাঁধা একমাত্র ধর্মপত্নী। তোমাকে কি আমি ঠাট্টা করতে পারি? আসলে তুমি আগের 'ব' অক্ষরটি শুনতে পাওনি।

—হয়েছে। ঢের হয়েছে। আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। বনানী তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সোফার এককোণে বসতে বসতে বলেছিল, তোমাদের মামা-ভাগ্নের কথার মধ্যে আমাকে আবার ডাকছো কেন?

—শোন সঞ্জুর কথা, বলে উঠেছিল পরিতোষ, বাবু এবার চাকরিতে জয়েন করতে চলেছেন। তাই যাবার আগে একটু পুণ্য অর্জন করতে ইচ্ছে হয়েছে। দেখতে-শুনতে যখন এমনি সুপুরুষ, তখন কোথায় কোন্ পাপকাজ করে বসে আছে কে জানে? তাই হয়তো কেদারবদ্রী—

—আঃ, তুমি একটু থামবে? পরিতোষকে একরকম ধমকে উঠেছিল বনানী। তোমার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না। ছোট ভাগ্নে, আর তুমি কিনা—

ছোটমামার কথায় সলজ্জ কণ্ঠে বনানীকে বলেছিল সঞ্জয়, ছোটমামার কথা ছাড়ো তো, মামী। আমি বলছিলাম কেদারবদ্রী যাবার কথা।

—কিন্তু এই মে-জুন মাসে তো ওখানে বৃষ্টি।

—না মামী, ওখানে যাবার এটাই সিজন। মে মাসের মাঝামাঝি অক্ষয় তৃতীয়ার আগে তো মন্দিরের দরজাই খোলে না।

নিঃসন্তান হলেও সুখী দম্পতি এই পরিতোষ ও বনানী। পরিতোষ সাধারণ গ্রাজুয়েট। কেবল নিজের অধ্যবসায় ও বুদ্ধির জোরে সে মাত্র দশ-বারো বছরের মধ্যে কলকাতার লোহার ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ায় তার নিজের ফ্ল্যাট। মারুতি গাড়ি।

দারুণ আমুদে লোক পরিতোষ। ছিপছিপে চেহারা। বছর চল্লিশের মত বয়স। ব্যাকব্রাস করা চুল। কথা বলে চোখে-মুখে। স্ত্রী বনানী অবশ্যি চেহারায় একটু ভারী হলেও স্বভাবে স্বামীর প্রায় কার্বন-কপি। সংসারে এমন প্রাণোচ্ছল একজোড়া দম্পতি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। আত্মীয়-পরিজনের বাড়ির যে কোন আনন্দ-অনুষ্ঠানে এঃ স্বামী-স্ত্রীযুগলই আসর মাতিয়ে রাখে। কেউ কেউ অবশ্যি বলে অন্য কথা। বলে, এটা নাকি ওদের বাইরের আবরণ। একটি সন্তানের জনক-জননী হতে না পারার দুঃখ ওরা নাকি এভাবেই ভুলে থাকতে চায়।

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের কুলিরা ততক্ষণে বাসের ছাদে উঠে যাত্রীদের মালপত্র গুছিয়ে রাখতে শুরু করেছে। যাত্রীরাও একে একে ধীরেসুস্থে বাসে উঠছে। তাড়াহুড়ো করে ভালো সিট দখলের চেষ্টা নেই। টিকিটের ওপরেই সিট নম্বর লেখা।

কবিৎকর্মা মানুষ পবিতোষ। হিমালয ভ্রমণে বাসেব জানালার সিটেব কদব বুঝেই বুকিংযেব সময বনানী ও সঞ্জযেব জন্যে বাসেব একই দিকে দুটো আলাদা জানালাব সিটেব ব্যবস্থা করে বেখেছিল। আব নিজেব জন্যে বনানীব পাশেব সিটটি। সিটগুলো সাজানো তিন দুই নিযমে। মাঝখানে সক প্যাসেজ।

একটু পবেই হৈ হৈ কবে বাসে ওঠে চাবজন যুবতীব একটি দল। কথাবার্তায বাঙ্গালী বলেই মনে হচ্ছিল। তবে চাবটি মেযেব তিনবকম বেশভূষা। দুজনেব ছেলেদেব মত জিনস সার্ট। একজনেব সালোযাব কামিজ। কেবল ওদেব মধ্যে বাস্কটিব পবনেই শাড়ি। বাইশ থেকে পঁচিশেব কোঠায প্রত্যেকেব বযস। কাঁধে সাইড ব্যাগ, হাতে বাস্কেট।

বাসে উঠেই একজন জিনস্ প্যান্ট, অন্যদিকেব জানালার সিটে বসে পড়ে ভাঙ্গা বাংলায বলে ওঠে, আমি ভাই এখানেই বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে অন্য জিনস প্যান্টটি, আচ্ছা চালু তো তুই মাযা। আগেই ভালো সিটটি দখল কবে নিলি? বলতে বলতে সেও বসে পড়ে তাব পাশে প্যাসেজেব দিকে। এদেব ববাদ্দেব বাকি দুটি সিটেব একটি প্যাসেজেব অন্যদিকে পবিতোষেব পাশে। অন্যটি সঞ্জয ও একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোকেব মাঝখানে। এই সিটটিই সবচাইতে খাবাপ। দুজনেব মাঝখানে স্যান্ডুইচেব মত অবস্থা।

এই বাকি দুটি সিট নিযেই শাড়ি ও সালোযাব কামিজেব মধ্যে শুরু হলো টান পোড়েন। পেছনে যেতে দুজনেরই আপত্তি। শাড়ি এবাব বিবক্তিব সুবে কতৃপক্ষেব ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে সোচ্চাব হয, একি ধবনেব কাণ্ড। আমরা চাবজন মেযে। আমাদেব একতলপ্তে দিলে পেছনেব ঐ উইণ্ডো সিটটা তো আমাদেবই হতো। তা না কবে মাঝখানে একজনকে ঢুকিযেই তো গোলমাল পাকিযেছে।

মাঝখানে এই একজন যে কে, তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয না সঞ্জযেব। কথাটি মিথ্যেও নয। ছোটমামা ম্যানেজ না কবলে তাব নিজেব এই সিটটা ওদেবই হতো। কথাটা ভাবতেই একটু অস্বস্তি বোধ কবে সঞ্জয। ব্যাপাবটা বুঝতে পেবে পবিতোষ ঘাড় ফিবযে ফিসফিস্ কবে সঞ্জযকে বললে একদম কথা বলিস না। চুপ্ কবে বসে থাক। সঞ্জয কিছু না বলে জানালা দিযে এমন ভঙ্গিতে বাইবেব দিকে তাকিযে থাকে যেন ঐ শাড়িব কোন কথাই সে শুনতে পাযনি।

শাড়ি এবাব তাব গাযেব ঝাল ঝাড়ে জিন্স্-সার্টদের ওপব। বলে, বেশ স্বার্থপব যা হোক তোবা। দিব্বি দু'টিতে আগেই ভালো জাযগা দু'টো দখল কবে নিযেছিস। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ কবে সেই মাযা ও অপব মেযেটি,

বেশ তো উজ্জ্বলাদি, তুমি আর জয়ন্তী এপাশে এসে বসো, আমরা ওদিকে যাচ্ছি।

—না, তোদের আর যেতে হবে না, জবাব দেয় উজ্জ্বলা, তোরা যেখানে বসেছিস্ সেখানেই বসে থাক। আমিই পেছনে যাচ্ছি। তারপর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার বললে, তুই সামনে বোস।

চার কন্যার মধ্যে এই জয়ন্তীই একটু শান্ত প্রকৃতির। কথাও বলে খুব আস্তে। বললে, না উজ্জ্বলাদি, সামনে প্যাসেজের পাশে তুমিই বসো। তোমাকে তো ঐ ঝুড়ির খাবার-দাবার সামলাতে হবে। রীনাটার তো আবার গাড়িতে চাপলেই ঘনঘন খিদে পায়। আমিই পেছনে যাচ্ছি। কথার সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি না করে সালোয়ার-কামিজ পরা জয়ন্তী মাদ্রাজী ভদ্রলোককে ডিঙ্গিয়ে চলে যায় মাঝের সিটে। টিপ্পনি কাটে রীনা, বাঃ, খিদে যেন আমার একারই পায়। তোরা যেন সবাই দাঁতে কুটো চেপে বসে থাকিস।

মায়া, রীনা, জয়ন্তী একই কলেজের ছাত্রী। ফিলজফি অনার্স নিয়ে বি-এ. পড়ছে। দলনেত্রী উজ্জ্বলা রীণারই পিসতুতো বোন। বছর ছ'য়েকের বড়। একটা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তীর্থের চাইতে হিমালয়ের সৌন্দর্য দর্শনেই এদের বেশি উৎসাহ।

টুরিস্ট বাস ছুটে চলেছে হিমালয়ের পার্বত্য পথে। একপাশে খাড়াই পাহাড়, অন্যপাশে খাদ। মাঝখানে সরু পাহাড়ী রাস্তা। নয়নাভিরাম দৃশ্য হিমালয়ের। চলার পথে প্রথম ঘণ্টাখানেক যাত্রীরা প্রায় নির্বাক। সবারই নজর হিমালয়ের সৌন্দর্যের দিকে। এক-আধটা পাহাড়ী শেয়াল ছাড় জীবজন্তু বলতে আর কিছু চোখে পড়ে না। এমনকি জঙ্গলে কোন পাখীও নয়। তবে নীচু উপত্যকায় রূপোলী রেখার মত প্রবহমান গঙ্গানদীর কাছাকাছি আকাশে দু' একটা উড়ন্ত পাহাড়ী চিল কিম্বা শকুনের দেখা মেলে।

মুগ্ধ বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পরেই বাসের মধ্যে শুরু হলো যাত্রীদের কথাবার্তা। তার আগে গাইড্ নটিয়াল জানিয়ে দিলে যে কেদারের পথে তাদের প্রথম বিরতি সহর পাউড়ী।

বাসের শব্দে ছুটে পালিয়ে যাওয়া একটা শেয়াল দেখে মায়া শের-- শের—বাচ্চা শের বলে চেঁচিয়ে উঠতেই পাশে বসা রীনা বিজ্ঞের মত হেসে বলে ওঠে, তোদের বিহারের শের বোধহয় ওমনি হয়, নারে?

—আলবৎ শের। জোরের সঙ্গে বলে ওঠে মায়া।

জবাব দেয় রীনা, চুপ কর্। লোকে শুনলে হাসবে।

—তাহলে ওটা কি?

—নেকড়ে—পাহাড়ী নেকড়ের বাচ্চা। পশুবিশারদের ভঙ্গিতে জবাব দেয় বীনা। এমনি সময় পেছনের সিটে বসা একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলে ওঠে, না দিদিমণি, ওটা বাঘও নয়, নেকড়েও নয়। স্রেফ একটা পাহাড়ীশেয়াল।

ভদ্রলোকের কথায় মায়া ও বীনা দু'জনেই লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। মায়ার পুরো নাম মায়া সিং। বিহারের মজঃফরপুরের মেয়ে। বছর দশেক কলকাতায় থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে মিশে প্রায় বাঙ্গালী হয়ে গেলেও বাংলা কথায় একটু টান আছে। আর অসতর্ক মুহূর্তে দু'একটা হিন্দী শব্দ বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। শেয়ালকে বাঘ ভেবে উত্তেজিত হয়ে শের বলে ফেলেছিল।

গল্পগুজব চলছে বাসের মধ্যে। পেছনের দিকে বসেব একটি দলের একটি কোলের বাচ্চার বাসের ঝাঁকুনি অপছন্দ হওয়ায় কাঁদতে শুরু করে। অবশেষে মায়ের কোল থেকে বাপের কাছে গিয়ে শান্ত হয়। সামনে ড্রাইভারের কাছাকাছি একটি যুবকের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে গাইড্ নটিয়াল। চুইংগাম চিবোচ্ছে দু'জনেই। সামনের দিকে মায়া ও বীনা নিচু কণ্ঠে গল্প করে চলেছে। এমনকি এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উজ্জ্বলার সঙ্গেও বিবাদ মিটিয়ে পরিচয় করে নিয়েছে পরিতোষ ও বনানী। কথায় কথায় উজ্জ্বলা জেনে ফেলে যে বনানীর এক ছোট্ট বোনপো নাকি উজ্জ্বলাদের স্কুলেই পড়ে।

মেয়েদের মধ্যে সবচাইতে মুশকিলে পড়েছে জয়ন্তী। একপাশের প্রৌঢ় গোমড়া-মুখো মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে ইংরেজিতে গল্প করার তো প্রশ্নই ওঠে না, আর অন্যপাশে সুদর্শন যুবক সঞ্জয়। উইণ্ডো সিট্ অধিকার করার অপরাধে সেই যে সে প্রথম থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, একবারের জন্যেও সে ঘাড় ফেরায় নি। ইতিমধ্যে উজ্জ্বলা ব্যাগ খুলে একমুঠো টফি বের করে মায়া ও বীণার হাতে দিয়ে বাকিটা ঘাড় ঘুরিয়ে জয়ন্তীর হাতে দেয়। টফি মুখে না পুরে হাতেই রেখে দেয় জয়ন্তী। উজ্জ্বলা এবার নিজের জন্যে কয়েকটা টফি বের করে খেতে গিয়েই কি মনে করে একটু ইতস্তত করে পরিতোষকে বললে, আপনারা কয়েকটা নিন্ না।

—না -না, আপনারা খান। আমাদের কি আর ওসব খাওয়ার বয়স আছে? হেসে জবাব দেয় বনানী।

—ঠিক বলেছ। বলে ওঠে পরিতোষ। তারপর উজ্জ্বলার প্রসারিত হাত হাত থেকে একটা টফি তুলে নিয়ে মোড়ক খুলে টপ্ করে মুখে পুরে আবার বললে, ছেলেরা মেয়েদের কাছে চিরকালই শিশু।

পরিতোষের কথার ধরনে হেসে ওঠে উজ্জ্বলা। স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ

পাকিয়ে বলে ওঠে বনানী, ভারি লোভি তো তুমি !

—এর মধ্যে লোভের কি দেখলে ? জবাব দেয় পরিতোষ, উনি তো আমার ছোটবোনের মত। ছোটবোন কিছু দিলে দাদা খাবে না ?

—খাঁটি কথা বলেছেন দাদা, খুশির সুরে উজ্জ্বলা বললে, দাদা যখন নিয়েছেন তখন আপনিও না হয় একটা নিন, বৌদি।

যাত্রাপথে অতি সহজেই পর হয়ে ওঠে আপন। দু'দিনের পরিচয়, কিন্তু তাই যেন কত মধুর। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার স্থিতিকাল কম বলেই বোধহয় এই পরিচয়ের মাধুর্য এত বেশি।

টফি চিবোতে চিবোতে পরিতোষ উজ্জ্বলাকে আবার বললে, আমরা তো দিব্বি গল্প করতে করতে বেশ টফি খাচ্ছি। এদিকে আমার পেছনের লোকটি বোধহয় গল্প করার লোকের অভাবে বেজার মুখে কেবল প্রকৃতির রূপসুধা পান করছে।

কথাটা কানে যেতেই সঞ্জয় একটু নড়েচড়ে বসে কেবল। কোন জবাব দেয় না।

বলতে থাকে পরিতোষ, আমার ভাগ্নে। বড়দির একমাত্র ছেলে। একদম গুড্-বয় যাকে বলে, ঠিক্ তাই। ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যাদবপুর থেকে ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর জোকার ইণ্ডিয়ান ম্যানেজমেণ্ট ইন্স্টিটিউট থেকে ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করে বেরিয়েছে। একটা বড় কোম্পানীতে চাকরি পেয়েছে। দিল্লীতে ছ'মাসের ট্রেনিংয়ে যাবে। চাকরিতে জয়েন করার আগে তাই ওর মামীকে নিয়ে আমরা মামা-ভাগ্নে তীর্থ করতে বেরিয়েছি।

পরিতোষের কথায় সঞ্জয় এতক্ষণে বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে সলজ্জ ভঙ্গিতে একবার তাকায় তার ছোটমামার দিকে। আর সেই সুযোগে উজ্জ্বলা সামান্য ঘাড কাত করে সঞ্জয়কে দেখে নিয়ে পরিতোষকে বললে, আপনার এই ভাগ্নেটি বোধহয় একটু কম কথা বলে, তাই না, দাদা ?

একেবারে দাদা বলে সম্বোধন। এটাই পরিতোষের বিশেষত্ব। আলাপ-পরিচয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজেকে অন্যের কাছে আপন করে নিতে পারে।

উজ্জ্বলার কথায় জবাব দেয় পরিতোষ, খুব বেশি কথা ও কোনকালেই বলে না। একেবারে মামার বিপরীত। তবে আজকের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। গাড়ি ছাড়ার আগে ঐ উইণ্ডো-সিট নিয়ে আপনি যে বাক্যবাণ ছুঁড়েছিলেন তার আঘাত থেকে বেচারি বোধহয় এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু সময় চুপ করে থেকে হঠাৎ হালকা সুরে বলে ওঠে

উজ্জ্বলা, ও—এই কথা ? তা, সে তো কখন চুকেবুকে গেছে।

পরিতোষের কথায় খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছিল সঞ্জয়। ছোটমামা যেন কি! মুখে কোন লাগাম নেই। একটু হাসতে চেষ্টা করে সে বললে, না—না, সেসব কিছু নয়। আসলে—

—আসল-নকল ছাড়ুন তো, নিজের ব্যাগের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলতে থাকে উজ্জ্বলা, দেখি, আপনার হাতে দুটো টফি গুঁজে দিয়ে আপনার সঙ্গে ভাব জমাতে পারি কিনা।

কথাটা শেষ করেই উজ্জ্বলা ব্যাগ থেকে খালি হাত তুলে হতাশ কণ্ঠে বললে, ও হরি, একটা টফিও যে আর অবশিষ্ট নেই। তাই তো—

ঠিক এমনি সময় পেছন থেকে মৃদু কণ্ঠে জয়ন্তী বললে, আমার কাছে আছে উজ্জ্বলাদি। আমি এখনও খাইনি।

—আছে, নাকি ? আনন্দের স্বরে বলে ওঠে উজ্জ্বলা, তা'হলে ও থেকে ওঁকে দু'টো দে না, ভাই।

ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় সঞ্জয়, না—না, আমি খাবো না। এখন ওসব খাওয়ার একদম ইচ্ছে নেই আমার।

সঞ্জয় অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও সেই মুহূর্তে তার দিকে এগিয়ে আসে টফি সমেত জয়ন্তীর একখানা হাত। টফির বদলে ঐ হাতখানার দিকেই কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে সঞ্জয়। একখানি পেলব সুন্দর হাতের পাতা যে এমনি কাব্যময় হতে পারে তা' এর আগে কোনদিন সে ধারণাই করতে পারেনি। হাতের পাঁচটি আঙুল যেন পাঁচটি সদ্য ফোটা চাঁপা ফুলের কলি। হাতের লাল্‌চে আভা যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ির বর্ণ। সেই হাতের চেটোয় রঙ্গীন কাগজে মোড়া টফি'টির সৌন্দর্য যেন ঐ হাতখানিই বাড়িয়ে তুলেছিল অনেকগুণ।

প্রাথমিক দ্বিধাটুকু কাটিয়ে আলগোছে একটি টফি তুলে নেয় সঞ্জয়। তারপর হাতের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে তাকায় হাতের মালিকের দিকে। দৃষ্টি বিনিময় হয় পরস্পরের। একটু সলজ্জ হাসি হাসে সঞ্জয়। জয়ন্তী চোখ নামায়। তারপর প্রায় একই সঙ্গে হাসিমুখে টফি মুখে দেয় তারা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাসের জানালাপথে হিমালয়ের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দেয় জয়ন্তীর চুল।

এঁকেবেঁকে পাহাড়ী পথে ছুটে চলেছে লাক্সারি বাস। বাসের গিয়ারের শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চড়াইয়ের পথে যেমনি তীব্র, তেমনি উৎরাইয়ের পথে স্তিমিত। বাসের ভেতর যাত্রীদের কথাবার্তা, আলোচনা বিভিন্ন ভাষায়;

জড়তাটুকু কেটে যেতেই সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, আপনারা কি কেবল কেদার-বদ্রী? নাকি যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীও যাবেন?

—না, এবার আর তা' হবে না। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় জয়ন্তী, ঐ দু'টো সেরেই কলকাতায় ফিরবো।

—আপনারা সবাই বুঝি কলকাতায় থাকেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জয়ন্তী বললে, হ্যাঁ, আমি নাকতলায়। আর আমার ঐ দুই বান্ধবী বীনা ও মায়া গাঙ্গুলী বাগান। মায়ার দেশ বিহারে। ওর পুরো নাম মায়া সিং।

—একই কলেজের ছাত্রী বোধহয় আপনারা?

—হ্যাঁ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী।

নাম জয়ন্তী, বাসস্থান নাকতলা, ছাত্রী যাদবপুর ইউনিভার্সিটির। সবগুলোই তো হুবহু মিলে যাচ্ছে। তবে কি এই সে? কে জানে? জয়ন্তী সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারলে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতো। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের সম্পর্কে এর বেশি কৌতূহল প্রকাশ করা শোভন নয় মনে করে সঞ্জয় কেবল বললে, আপনাদের এই উজ্জ্বলাদি কিন্তু বেশ স্মার্ট। উনিও কি আপনাদের যাদবপুরেরই ছাত্রী?

জবাব দেয় জয়ন্তী, না, উনি একটা ছোটদের স্কুলের টিচার। ঐ বীনার পিসতুতো দিদি। থাকেন খড়দা। সত্যি, খুব স্মার্ট। ওঁর ভরসাতেই তো আমরা একা বেরিয়েছি।

জয়ন্তীর পরিচয়টা তখনও মাথার মধ্যে ঘোরফের করতে থাকে সঞ্জয়ের। এই মেয়েটিই যদি সে হয় তা হলে ব্যাপারটাকে অদ্ভুত যোগাযোগই বলতে হবে। হয়তো বা কোনরকম ইঙ্গিতবাহী। কথাটা একবার ছোটমামাকে বললে হতো। কিন্তু এখানে এই অবস্থায় বলা চলে না।

সঞ্জয়কে চুপ করে থাকতে দেখে জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে, আপনারাও কি কলকাতায় থাকেন?

জবাব দেয় সঞ্জয়, হ্যাঁ, আমার ঐ ছোটমামা বালীগঞ্জে, আর আমি মানিকতলায়। আপনাদের মত আমারাও কেবল কেদার-বদ্রী।

এতক্ষণে সিট ছেড়ে উঠে দাড়ায় গাইড্ নটিয়াল। বাসের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বললে, লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন, ওদিকে নিচে তাকিয়ে দেখুন। ঐ যে দু'টো জলধারা দেখছেন ওর একটা গঙ্গা, আপনারা কলকাতার লোকেরা যাকে ভাগীরথী বলেন। আর অন্যটা অলকানন্দা। এই দু'টো নদী যেখানে গিয়ে মিশেছে সেই সঙ্গমের নামই দেবপ্রয়াগ।

নটিয়ালের কথায় সবাই জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করে নদী দু'টোকে। জয়ন্তীও সামান্য ঝুঁকে পড়ে জানালার দিকে। তার দেহের মেয়েলী গন্ধ স্পষ্ট এসে লাগে সঞ্জয়ের নাকে।

বলতে থাকে নটিয়াল, ছোট্ট জনপদ ঐ দেবপ্রয়াগ। ওখানে দশ মিনিটের জন্য বাস থামবে। ইচ্ছে করলে আপনারা নেমে চট্পট্ চা-কফি খেয়ে নিতে পারবেন। তারপর সেখান থেকে সোজা পৌড়ি গিয়ে আমাদের রাতের বিশ্রাম।

নটিয়ালের কথা শেষ হতে না হতেই বাসের চাকায় জোর একটা হাওয়ার শব্দ। পরক্ষণেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায় বাস।

—কি হলো—ক্যা হুয়া—হোয়াট্স দ্য ম্যাটার? যাত্রীদের কলকণ্ঠ জেগে ওঠে বিভিন্ন ভাষায়। গাড়ির খালাসী ও গাইড্ নটিয়াল তাড়াতাড়ি নেমে যায়।

একটু পরেই নটিয়াল ফিরে এসে ঘোষণা করে, ডোন্ট্ ওরি। তেমন কিছুই হয়নি। পাথরে ধাক্কা লেগে গাড়ির একটা চাকা কেবল পাংকচার হয়েছে। দশ-পনেরো মিনিটেই নতুন চাকা লাগানো হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে এই সময়টুকু আপনারা নিচে নেমে একটু ঘোরাফেরা করতে পারেন।

কথাটা কানে যেতেই হৈ-হৈ করে নেমে গেল ছেলেছোকরারা। বাসের ভেতর বয়স্কদের সামনে বসে সিগারেট খেতে না পেরে যাদের প্রাণ আইঢাই করছিল তারা অতিশয় ব্যস্ত হয়ে ওঠে এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহারে।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে পরিতোষ বনানীকে বললে, চলো, আমরাও একবার নিচে নেমে হাত-পা একটু ছড়িয়ে আসি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় পরিতোষ ও বনানী। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে সঞ্জয়ও। পরিতোষ উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, চলুন না, নিচে যাই। এখানে শুধু শুধু বসে থেকে কি করবেন?

—হ্যাঁ, চলুন। বলতে বলতে উঠে দাড়ায় উজ্জ্বলা। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী তিনজনও। অবশেষে দু'টি দল একসঙ্গে মিশে গিয়ে বাস থেকে একে একে সাতজন নেমে আসে। আচার-আচরণে এই গোটা দলটিরই লিডার বলে মনে হচ্ছিল পরিতোষকে।

পথের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে যাত্রীরা। কারুর হাতে সিগারেট, কারুর হাতে সঙ্গে নিয়ে আসা পথের ভাজাভুজি খাবার। কেউ দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কেউ বা দল বেঁধে হেঁটে চলেছে। এরই মধ্যে দু'এক জোড়া গায়ে গা-ঘেঁসে হাঁটতে হাঁটতে একটু নির্জন জায়গা খুঁজছে।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে পরিতোষ, বনানী ও উজ্জ্বলা। অন্যদিকে মায়া, রীনা ও জয়ন্তী। সঞ্জয় কিন্তু কোন দলেই ভিড়ে না গিয়ে পথের পাশে একখানা বড পাথরের ওপর পা রেখে দূরে তাকিয়ে থাকে। যতদূর চোখ যায় কেবল ঢেউ-খেলানো পর্বতশ্রেণী। জঙ্গলে মোডা সবুজ সেই পর্বতশ্রেণীর কোথাও কোথাও আবার ন্যাডা পাথরেব স্তূপ—ল্যাণ্ড্-স্লাইডেব চিহ্ন। অসংবৃত নাবীব গায়েব ওডনাব মত কোন কোন পাহাডেব গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে এক-আধ টুক্‌রো মেঘ। নিচে—অনেক নিচে গঙ্গা কিম্বা অলকানন্দাব জলের রেখা। তন্ময় হয়ে হিমালয়ের সেই রূপ উপভোগ করছিল সঞ্জয়।

হঠাৎ কানের কাছে নারীকণ্ঠ, একি সঞ্জয়বাবু, আপনি একা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চলুন না আমাদেব সঙ্গে।

চম্‌কে ফিবে তাকায় সঞ্জয়। বীনা তাকে ডাকছে। মুখে তাব দুষ্টুমিব হাসি। একটু দূরে খুন্‌সুটি চলছে মায়া ও জয়ন্তীর মধ্যে। জয়ন্তীব ওডনা দু'হাত টেনে ধবে মায়া খিল্‌খিল্ কবে হাসছে আব জয়ন্তী কৃত্রিম বিবক্তিতে সামলাতে চেষ্টা করছে গায়েব সেই ওডনা।

একটা ঢোক গিলে সঞ্জয় জিজ্ঞেস কবে, কোন্‌দিকে চললেন আপনাবা?

দূরে আঙ্গুল তুলে জবাব দেয় রীনা, ঐ টিলাটার দিকে।

—সেকি, ওখানে যেতে-আসতে তো অনেক সময় লাগবে। বিস্মিত কণ্ঠস্বর সঞ্জয়ের।

জবাব দেয় বীনা, তাতে কি হয়েছে? দশ-পনেরো মিনিটে কি আব পুরানো চাকা খুলে নতুন চাকা লাগাতে পাববে?

—যদি ওদের কাজ তাডাতাডি হয়ে যায়?

—যায় তো যাবে। আমাদের এখানে ফেলে রেখে তো আর গাডি চলে যেতে পারবে না?

—কিন্তু তাই বলে এই সময় এতদূব যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ইতস্তত করতে থাকে সঞ্জয়।

—দেখুন, বলে ওঠে রীনা, আপনাকে ডাকতাম না। আমরা নিজেবাই চলে যেতে পারতাম। কিন্তু ঐ জয়ন্তীটার জন্যেই আপনাকে ডাকতে হচ্ছে।

মনের কৌতূহল চেপে জিজ্ঞেস কবে সঞ্জয়, কেন?

ঠোঁটচেপে মৃদু হেসে বলতে থাকে রীনা, জানেন, একনম্বরের ভিতু ঐ জয়ন্তীটা। এতকরে বলছি, কোন ভয় নেই। মেয়ে হলেও পুরুষের পোশাকে আমরা দু'জন রয়েছি তোর সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়। একজন আসল

পুরুষ সঙ্গে না থাকলে ও ঠিক্ ভরসা পাচ্ছে না। কথার শেষে আবার মুচ্‌কি হাসে রীনা।

একটু সময় চিন্তা করে সঞ্জয়। তারপর বললে, ঠিক আছে, চলুন।

কথা বলতে বলতে চারজন এগিয়ে চলেছে সেই টিলাটার দিকে। কথার বিষয়বস্তু হিমালয়ের এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনা। বলাবাহুল্য, বক্তা সঞ্জয় এবং শ্রোতা বাকি তিনজন।

একসময় মায়া তার ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করে, শুনলুম, আপনি নাকি ইঞ্জিনিয়ার। তা' এই পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে এত জানলেন কেমন করে?

মৃদু হেসে জবাব দেয় সঞ্জয়, বই পড়ে।

—সিরফ্ কিতাব?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সঞ্জয় আবার বললে, তা'ছাড়া আর কি? আমি তো এর আগে আর এদিকে কখনও আসিনি?

জিজ্ঞেস করে রীনা, আপনি বুঝি খুব বই পড়েন?

—খুব আর কোথায়? জবাব দেয় সঞ্জয়, তবে সময় পেলে পড়তে চেষ্টা করি।

মায়া আবার বললে, একটা কথা বলছি, ডোণ্ট্ মাইণ্ড। আমরা তো শুনেছি ইঞ্জিনিয়াররা নাকি একটু—একটু—একটু—। সঠিক শব্দটি মনে না পড়ায় রীনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাংলায় কি যেন বলে? রাফ্— আই মীন্ হার্ড-হার্টেড—।

জবাব দেয় রীনা, কাটখোট্টা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, কাটখোট্টা, বলতে থাকে মায়া, তারা নাকি ঐ লোহালক্কড় ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কিন্তু আপনার কথায় তো ঠিক্ তা' মালুম হচ্ছে না।

মায়ার কথায় এবার হো-হো করে হেসে ওঠে সঞ্জয়। হাসি থামিয়ে হাল্কা সুরে জবাব দেয়, বোধহয় আমি ঠিক্ লোহালক্কড়ের ইঞ্জিনিয়ার নই বলে।

—তার মানে? মায়ার চোখে কৌতূহল।

জবাবে সঞ্জয় বললে, আমি লেখাপড়া করেছি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে।

—তাই বুঝি আপনার ভাবনা-চিন্তাও একটু সূক্ষ্ম ধরনের? কথাটা বলেই রীনা হেসে ওঠে খিল্ খিল্ করে।

জয়ন্তী এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। তাই নিয়ে মায়া এবার পেছনে লাগে

জয়ন্তীর। বলে, ওকি তুই যে দেখছি একদম ডাম্ব্—বোবা হয়ে গেলি রে জয়ন্তী ?

জয়ন্তী কিছু জবাব দেবার আগেই বলে ওঠে রীনা, ও তো বাসের সারাটা পথ সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই বোধহয় একটু দম নিচ্ছে।

রীনার পিঠে একটি আদরের কিল বসিয়ে জয়ন্তী কিছু বলার জন্যে মুখ তোলে, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। পেছনে জেগে ওঠে বাসের তীক্ষ্ণ হর্নের শব্দ।

—চল্—চল্—শিগ্‌গির ফিরে চল্। ঘুরে দাঁড়ায় সবাই। তারপর লম্বা পা ফেলে তারা চলতে থাকে বাসের দিকে।

সঞ্জয়রা চারজন ছাড়া আর সবাই ততক্ষণে উঠে পড়েছে বাসে। বাসের মধ্যে ঢুকেই মায়া ও রীনা বসে পড়ে তাদের নির্দিষ্ট সিটে।

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় জয়ন্তীকে বললে, নিন, চলুন।

—আমি কেন, আপনি-ই তো আগে গিয়ে বসবেন। বলে ওঠে জয়ন্তী।

জবাবে সঞ্জয় বললে, না, আপনি আগে যান। আমি এতক্ষণ ঐ উইণ্ডো সিটে বসেছি। এবার আপনার পালা। আপনি বসবেন।

সঞ্জয়ের কথার পিঠে হঠাৎ বলে ওঠে পরিতোষ, ইয়েস, ঢ্যাটস লাইক এ ওয়াইজ ইয়ং ম্যান। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উজ্জ্বলাকে বললে, দেখলে তো দিদি, একেই বলে মামার আসল ভাগ্নে। মামার ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি ভাগ্নে না সংশোধন করতে পারে তবে সে কিসের ভাগ্নে।

সঞ্জয় বুঝতে পারে তার এই চতুর ছোটমামাটি এর মধ্যেই উজ্জ্বলার সঙ্গে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। ঈশ্বর জানেন, কেদারনাথ পৌঁছবার মধ্যে তুমি থেকে তুইতে নামাও বিচিত্র নয়।

জয়ন্তীও যাবে না, সঞ্জয়ও ছাড়বে না। শেষে উজ্জ্বলাই জয়ন্তীকে বললে, এতকরে যখন বলছে তখন যা না। গিয়ে বোস্ ঐ সিটে।

জয়ন্তী একবার আড়চোখে তাকায় রীনা ও মায়ার দিকে। যেন এদিকে একেবারে নজরই নেই, এমনি ভঙ্গিতে তারা গল্প করে চলেছে নিজেদের মধ্যে। একমুহূর্ত দ্বিধা করে জয়ন্তী। তারপর সঞ্জয়ের দিকে একটা কটাক্ষ হেনে মাদ্রাজী ভদ্রলোককে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে বসে সঞ্জয়ের সিটে। সঞ্জয়ও এরপর অনুসরণ করে তাকে।

বাস চলছে দেবপ্রয়াগের দিকে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে জয়ন্তী। লজ্জায় সে তখনও সঙ্কুচিত। তার এই লজ্জার

জন্যে দায়ী পাশের এই লোকটি। কি দরকার ছিল সবার সামনে প্রায় জোর করে তাকে এই সিটে বসাবার? রীনা ও মায়া যে এরপরে তার পিছনে লাগবে তা'তো অবধারিত। কি বলে তখন সে তাদের থামাবে?

জয়ন্তীর মনের কথা যেন টের পায় সঞ্জয়। একসময় সে মৃদুকণ্ঠে বললে, আমার ওপর রেগে গেছেন, তাই না?

জয়ন্তী কোন জবাব না দিয়ে জানালার দিকে আর একটু ঘেঁসে বসে কেবল। সঞ্জয় আবার বললে, বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কোনকিছু ভেবে আপনাকে এই সিটে বসতে বলিনি। ভাবলাম আমি তো এতক্ষণ বসেছি। এবার না হয় আপনি কিছুক্ষণ বসলেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এভাবে আপনাকে আমি লজ্জায় ফেলেছি। এক্সকিউজ মী—ক্ষমা করুন আমাকে।

জানালা থেকে মুখ সরিয়ে এনে মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি জবাব দেয় জয়ন্তী, না—না, তেমন কিছু না। জাস্ট্—। কথাটা অসমাপ্ত রেখেই একটু হাসে।

এসে গেল দেবপ্রয়াগ। ছোট্ট জনপদ। স্পষ্ট দেখা যায় অলকানন্দা ও গঙ্গা সঙ্গমস্থল। শান্ত, নীল, কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল অলকানন্দার। আর প্রচণ্ড অশান্ত গঙ্গা। শান্ত ও অশান্ত জলরাশির সংমিশ্রণ এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে এখানে। পাশেই কয়েকটা ছোট মন্দির।

বাস প্রায় ফাঁকা। দশমিনিটের বিশ্রামে যাত্রীরা গিয়ে ঢুকেছে একটা ছোট চা-দোকানে। দোকান ছোট হলেও এ জাতীয় যাত্রীদের দঙ্গল সামলাবার মত রসদ যে এদের যথেষ্টই মজুত তা' কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না। চমৎকার আবহাওয়া। অল্প ঠাণ্ডা। এই আবহাওয়ায় গরম চায়ের সঙ্গে কোন্‌কালের ভাজা ঠাণ্ডা পকৌড়ি কিন্তু খারাপ লাগে না।

খাওয়ার পরে গোটা সাতজনের দলের পয়সাটা পরিতোষ দোকানীর হাতে তুলে দিতেই প্রতিবাদ করে ওঠে চারজনের দলনেত্রী উজ্জ্বলা। বলে ওঠে, এ কেমন কথা দাদা? আমাদের পয়সা আপনি দেবেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজনও সমস্বরে সমর্থন করে উজ্জ্বলাকে।

প্যাণ্টের পকেটে মানিব্যাগ ঢুকিয়ে বেশ ধীরেসুস্থে পর্যায়ক্রমে চারজন যুবতীর মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জবাব দেয় পরিতোষ, যেহেতু, এখন থেকে আমি এই গোটা সাতজনের দলেরই নেতা।

ব্যাস্, এর পরে আর কথা চলে না। দোকান থেকে বাইরে বেরোতে বেরোতে উজ্জ্বলা বলে, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিকে একটু চিন্তা হয়েছিল। মাত্র চারজন মেয়ে এতদূর

চলেছি। পথে কতরকম বিপদ-আপদ থাকতে পারে। সম্পূর্ণ দায়িত্বই তো আমার ওপর।

একটু থেমে উজ্জ্বলা আবার বলতে থাকে, জয়ন্তীর বাবা পরেশ মেশোমশাই তো স্পষ্টই বলেছিলেন, দেখো মা, সঙ্গে কোন পুরুষ যাচ্ছে না। এতদূরেব পথ। জবাবে আমি কিন্তু তাঁকে বলেছিলাম, কিচ্ছু ভাববেন না, মেশোমশাই। ইউ. পি. সরকারের ব্যবস্থাপনায় যাচ্ছি আমরা। কোন ভয় নেই। তাছাড়া, পথেই তো কত লোকেব সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। সত্যিই তাই ঘটলো। একেবাবে দায়িত্বমুক্ত করতে পাওয়া গেল আপনাকে আব বৌদিকে।

—এ কেমন কথা বলছো, উজ্জ্বলাদি? বলে ওঠে রীনা, কেবল এই দাদা ও বৌদি? ঐ ভদ্রলোক বুঝি কিছু না? বলেই সে সঞ্জয়কে দেখিয়ে দেয়।

উজ্জ্বলা কিছু জবাব দেবার আগেই মুচ্‌কি হেসে মায়া বলে ওঠে, উনি না থাকলে জয়ন্তীর গোটা জার্নিটাই তো বোর লাগতো। ও কথা বলতো কার সঙ্গে? ঐ তামিলনাড়ুব সঙ্গে?

মায়াব কথায় জয়ন্তী বাগতে গিয়েও মাদ্রাজী ভদ্রলোককে তামিলনাড়ু বলায় সবার সঙ্গে সেও হেসে ওঠে। বাসে ওঠাব সময় জয়ন্তী কেবল মায়ার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়। হাসতে হাসতে মায়া বলে, বেশ তো, মার্‌। লেকিন সত্য কথা আমি বলবোই।

(দুই)

পাউড়ী গাড়োয়ালেব জেলা-সহব পাউড়ী। ভাবি সুন্দর এখানকাব টুরিস্ট বাংলো—একটা ছোট টিলার ওপব। টিলাব গায়ে থবে থরে সাজানো পাহাড়ী ফুল গাছ। নানা রংয়ের বাহারী ফুল ফুটে বয়েছে তাতে। আকাশ পবিস্কাব থাকলে এই বাংলো থেকেই কেদাব, বদ্রী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, এই চাব ধামের পাহাড়ের চুড়োগুলো দেখা যায়।

পবিতোষের ব্যবস্থাপনায় পাশাপাশি দুটো ঘরেই গোটা দলের থাকার ব্যবস্থা। একটায় পরিতোষেরা, অন্যটায় চার কন্যা।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একখানা ডবলবেডের খাটে পরিতোষ ও সঞ্জয়, আর একখানা সিংগ্‌ল খাটে বনানী। একটু আগেই একপ্রস্থ চা হয়ে গেছে। আধশোয়া অবস্থায় সারা গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে পরিতোষ কথা বলছে বনানীব সঙ্গে। পরিতোষের পাশে টান হয়ে শুয়ে চোখবুজে আছে সঞ্জয়। মাথায় তার চিন্তা—সত্যিই কি ঐ জয়ন্তী মেয়েটি সেই? সম্ভাবনা খুবই বেশি।

নাকতলায় বাস—নাম জয়ন্তী—যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। খানিক আগে আবার শোনা গেল বাবার নাম পরেশ। তা'হলে সবই তো মিলে যাচ্ছে। সঞ্জয়ের স্মরণশক্তি যদি দুর্বল না হয় তা'হলে কলকাতায় তার বাবার টেবিলের ওপর রাখা কাগজটায় সে ঠিক ঠিক এই নামধামই দেখতে পেয়েছিল। কেবল এটাই নয় ঐ কাগজে আরও যে দশ বারোটা নাম লেখা ছিল সেগুলোও তার মোটামুটি মুখস্ত।

বিষয়টিকে কি সম্পূর্ণ চেপে যাবে সঞ্জয়? নাকি সুযোগমত একসময় সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবে ঐ জয়ন্তীকেই। না, সেটা ভালো হবে না। জয়ন্তী লজ্জা পেতে পারে। এমনিতেই তো আজ সারাদিন বাসের মধ্যে তাদের দু'জনকে নিয়ে ঐ বিচ্ছু রীনা ও মায়ার ঠাট্টার অন্ত ছিল না। তারওপর ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে বেচারীর ভ্রমণটাই মাটি হতে পারে। তার চাইতে চুপ্ করে থাকাই ভালো। আবার চুপ্ করেও শান্তি নেই। কৌতূহল বারবার মনের আনাচে কানাচে উঁকি দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে, সত্যিই কি এই মেয়েটিই সেই? কোথাও কোন ভুল হয়নি তো? তা'হলে তো সেই ভুল ধারণা নিয়েই থাকতে হবে সঞ্জয়কে। তার চাইতে বিষয়টা যাচাই করে নেয়া কি ভালো নয়? তবে প্রশ্ন হলো কিভাবে যাচাই করবে?

অবশেষে একসময় সে ঠিক্ করে এসব ব্যাপারে তার ঐ ছোটমামার মস্তিস্ক যখন পরিষ্কার তখন তাকেই বিষয়টা জানানো ভালো।

সঞ্জয় যখন পরিতোষের পাশে শুয়ে চোখ বন্ধ করে এই সব ভাবছিল তখন পাশের ঘরে থেকে থেকেই জেগে উঠেছিল হাসির শব্দ।

চার কন্যার ঘরেও দু'খানা খাট। তবে দু'খানাই ডবল বেডের। ঐ ঘরেও তখন কম্বলের তলায় চার কন্যা। একখানা খাটে উজ্জ্বলা ও জয়ন্তী, অন্যটায় রীনা ও মায়া। তাদের আলোচনার বিষয় হিমালয় ভ্রমণ হলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বাসের মধ্যে জয়ন্তীর আচার-আচরণ। যথারীতি রীনা ও মায়া যা বলছিল, জয়ন্তী হাসিমুখে চুপ্ করে কেবল তা শুনছিল। এখানে বান্ধবীদের মধ্যে এনিয়ে তার তেমন কোন সঙ্কোচ না থাকলেও সে কোন জবাব দিচ্ছিল না। উজ্জ্বলা অবশ্যি মাঝে মাঝে জয়ন্তীকে গার্ড করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

একসময় রীনা হেসে বললে, আচ্ছা উজ্জ্বলাদি বাসের মধ্যে আজ যা ঘটলে তা যদি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী হয় তা'হলে এ থেকে আমরা তো অনেক কিছুই অনুমান করে নিতে পারি, কেমন?

—কি এমন ঘটলো তা-ই আগে পরিষ্কার করে বল্। বলে ওঠে উজ্জ্বলা।

জবাব দেয় রীনা, এই যে পাশাপাশি বসে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে জয়ন্তী

ফিস্‌ফিস্‌ কথাবার্তা।

—ফিস্‌ফিস্‌ করে বলবে না তো, চিৎকার করে বাসের সবাইকে জানিয়ে বলতে হবে নাকি? তেড়ে ওঠে উজ্জ্বলা।

মায়া জবাব দেয়, ঠিক্‌ বলেছ উজ্জ্বলাদি। এসব কথা তো ছিপাকে বলারই নিয়ম।

মায়াকে ধম্‌কে ওঠে রীনা, ছিপাকে কিরে? বল্‌, চুপি চুপি।

—ঠিক্‌ বলেছিস। চুপি চুপি। নিজেকে সংশোধন করে মায়া।

বলতে থাকে উজ্জ্বলা, কথা বলার আব যখন কেউ নেই তখন গোমড়া মুখে বসে না থেকে পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বলে এমন কি অন্যায় করেছে জয়ন্তী?

—ছি—ছি, অন্যায়? কভি নেহি, উৎসাহে শোয়া অবস্থা থেকে বিছানায় একেবারে উঠে বসে রীনা। তারপর আবার বলতে থাকে, অন্যায়ের কথা কে বলছে? আমি তো বলছি খুব ভালো কাজ করেছে জয়ন্তী। এখন ঠিক মত গেঁথে তুলতে পারলে একটা কাজের মত কাজ করবে। ওর বাবাকে আব রবিবারের খবরের কাগজ দেখে চিঠি পাঠিয়ে হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হবে না।

বলে ওঠে উজ্জ্বলা, কেন, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি?

—আদপেই না। আমি—

রীনার কথা শেষ হবার আগেই এবার মুখ খোলে জয়ন্তী। বললে তুমি ওকে বলো না উজ্জ্বলাদি, এখনও তো অনেক রাস্তা যেতে-আসতে হবে, এবার থেকে আমার ঐ সিটে ও-ই বসবে। দেখুক না একবার চান্স নিয়ে। পুরুষেব মন। বলা তো যায় না কিছু। কথার শেষে হেসে ওঠে জয়ন্তী। সেই সঙ্গে আর সবাই।

উজ্জ্বলা এবার জয়ন্তীকেই জিজ্ঞেস করে, সত্যি নাকি বে? তোর বাবা এব মধ্যেই তোর জন্যে পাত্র খুঁজে বেড়াতে শুরু করেছেন? তোর লেখাপড়া শেষ হবার আগেই?

সলজ্জ ভঙ্গিতে চুপ করে থাকে জয়ন্তী। বলতে থাকে রীনা, ও কি বলবে? তুমি আমাকেই জিজ্ঞেস করো, উজ্জ্বলাদি। মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী নন ওর বাবা। পারলে হয়তো গৌরীদান করে বসতেন। ওর বড়দির বিয়ে দিয়েছিলেন নাকি তার আঠারো বছর পূর্ণ হবার আগেই। ওর মেজদিরও প্রায় তাই। সেদিক থেকে ওর বাবার কাছে ও তো প্রায় বুড়ি হয়ে উঠেছে। আঠারোর পরে চার-পাঁচটা বছর কেটে গেছে। আর কি অপেক্ষা করতে পারেন তিনি? তাই তো খবরের কাগজ দেখে দেখে প্রতি

সপ্তাহে চিঠি ছাড়েন। এর মধ্যে দু'একটা পার্টি এসে নাকি ওকে দেখেও গেছে। কি বলিস্ রে জয়ন্তী, আমি মিথ্যে বলেছি ?

বীনা থামতেই মায়া বললে, ভালোই তো, জয়ন্তী নিজেই যদি নিজের জন্যে একটা বন্দোবস্ত্ করে ফেলতে পারে তাতে তো ওর বাবার উপকার করাই হবে।

—বন্দোবস্ত নারে, ব্যবস্থা। মায়াকে সংশোধন করে রীনা।

জয়ন্তী কথা না বলে মনে মনে কেবল একটু হাসে। তার এই বন্ধুরা তো তার বাবাকে চেনে না! নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করার ঘোর বিরোধী তিনি তার ছোট পিসি এরকম একটা কাজ করায় তার বাবা তার সেই ছোট পিসির সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেন নি। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর থেকে তার সেই ছোট পিসি অনুনয় বিনয় করে নিজের দাদাকে কত চিঠি লিখেছে, কিন্তু তার বাবা অটল-অনড়। তার মা পর্যন্ত তার বাবাকে কত বুঝিয়েছেন, একটা মাত্র বোন। বাপ-মা নেই। সে না হয় একটু অন্যায় করেই ফেলেছে, কিন্তু তাই বলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে? তা'ছাড়া, পাত্রটিও তো খারাপ নয়। পা'ল্টি ঘর। বেজাত-কুজাত নয়। দেখতে শুনতেও ভালো। রেলের ইঞ্জিনিয়ার। জবাবে জয়ন্তীব বাবা কেবল গম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন, আমাকে বোঝাতে এসো না। এত বড স্পর্দ্ধা যে নিজে দেখে-শুনে বিয়ে করলো! বেশ, এতই যদি স্বাধীন তা'হলে সারাজীবন একাই থাক্। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না। সেই ভয়েই বোধহয় তার বাবা তাড়াতাড়ি বড় আর মেজ মেয়েব বিয়ে দিয়ে এখন সেজ অর্থাৎ জয়ন্তীর জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছেন। এমনিতে স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও এই একটা ব্যাপারে মেয়েদের স্বাধীনতার ঘোর বিবোধী তিনি।

উজ্জ্বলা এবার বললে, তোরা যে যাই বলিস, ঐ সঞ্জয় মানুষটি কিন্তু বেশ ভদ্র। যেমনি দেখতে-শুনতে তেমনি লেখাপড়ায়। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নাকি ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর জোকার ম্যানেজমেন্ট ইন্সস্টিটিউট্ থেকে ম্যানেজমেণ্টের ডিগ্রী। মস্ত বড় চাকরি পেয়েছে। শিগ্‌গিরই দিল্লী যাবে ছ'মাসের ট্রেনিংয়ে।

—তাই নাকি? বলে ওঠে রীনা, তুমি এত খবর জোগাড় করলে কেমন করে?

জবাব দেয় উজ্জ্বলা, বারে, ওর ঐ ছোট মামাই তো বললেন।

পরিতোষের প্রসঙ্গ উঠতেই রীনা বললে, ঐ মানুষটি কিন্তু ভারি চমৎকার, উজ্জ্বলাদি। যেমনি মিশুক, তেমনি আমুদে। দেখ তো, মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মত চার চারটা জাঁদরেল মেয়েকে কেমন হাত করে ফেললেন।

—আমরা জাঁদরেল নাকি ? প্রশ্ন করে মায়া।

জবাব দেয় রীনা, আলবৎ। নইলে কি আমরা একা এই হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়তে পারতাম ?

উজ্জ্বলা বললে, বৌদিও ঠিক দাদার মত। একেবারে কার্বন কপি।

—মেড্ ফর ইচ্ আদার। মন্তব্য করে মায়া।

জয়ন্তীর পেছনে লাগা কিন্তু তখনও শেষ হয় নি রীনার। জয়ন্তীর মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে নিরীহ ভঙ্গিতে বললে, আচ্ছা উজ্জ্বলাদি, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু বাসের মধ্যে জয়ন্তীর ঐ সিট বদল করা আর তাতে তোমার মদত দেবার ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—আমার মদত দেয়া ? কৃত্রিম বিস্ময়ে ভ্রু কুঁচকে ওঠে উজ্জ্বলার।

—বাঃ, জয়ন্তী তো প্রথমে রাজিই হয় নি। শেষে তুমি বলতেই তো ও গিয়ে বসলো ভদ্রলোকের সিটে।

—ও—এই কথা ? একেই তুই মদত দেয়া বলছিস্ ? বলতে থাকে উজ্জ্বলা। আসলে ভদ্রলোক এত অনুরোধ করেছিলেন বলেই আমি ওকে যেতে বলেছিলেন।

—তাই বুঝি ? মুখ টিপে হাসে রীনা, আমি ভাবলাম অন্য কিছু।

জিজ্ঞেস করে উজ্জ্বলা, তুই আবার এর মধ্যে অন্য কি ভেবে বসলি ?

নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দেয় রীনা, ওদের এই সিট বদলকে আমি কিন্তু আংটি বদল কিম্বা মালা বদলের পূর্বাভাস বলেই মনে করেছিলাম।

রীনার কথায় একটা হাসির ঢেউ জেগে ওঠে ঘরের মধ্যে। হাসতে হাসতে উজ্জ্বলা রীনাকে বললে, এত সবও তোর মাথায় আসে ?

বলে ওঠে জয়ন্তী, ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্রী তো। তাই ইম্পোরটেড্ সারে ওর মাথাটা বরাবরই একটু বেশি উর্বর, উজ্জ্বলাদি।

এ ঘরে যখন হাসি-মসকরা চলছে তখন পাশের ঘরের আবহাওয়া একটু অন্যরকম। গোপন কথা শোনার উৎসাহে বনানী ততক্ষণে নিজের খাট ছেড়ে এসে বসেছে তার স্বামীর পাশে। মামা, মামী ও ভাগ্নে কম্বল গায়ে দিয়ে মুখোমুখি বসে কথা বলছে। বক্তা সঞ্জয়, বাকি দু'জন শ্রোতা।

সঞ্জয় থামতেই বনানীর প্রতিক্রিয়া, ভারি আশ্চর্য তো। এমন ঘটনাও সত্যি সত্যি ঘটে !

—ঘটবে না কেন ? জবাব দেয় পরিতোষ, একেই বলে যোগাযোগ। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়কে, তুই সিওর ?

জবাব দেয় সঞ্জয়, সিওর কিনা বলবো কেমন করে ? তবে সম্ভাবনা প্রবল।

একটু চিন্তা করে পরিতোষ আবার বললে, তা'হলে তো দেখছি ব্যাপারটা একটু যাচাই করতে হয়। হলে কিন্তু দারুণ, কি বলো তুমি? কথাব শেষে পরিতোষ বনানীর দিকে তাকায়।

—দারুণ তো বুঝলাম। কিন্তু এটা যাচাই করবে কেমন করে? বনানী জিজ্ঞেস করে, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে চাও নাকি?

—পাগল! একটু সময় চিন্তা করে পরিতোষ। তাবপর হঠাৎ বনানীর আরও একটু কাছে সরে গিয়ে তাব কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলে।

বিব্রত ভঙ্গিতে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করতে চাও, ছোটমামা?

—তা' দিয়ে তোর দরকার কি?

—কিন্তু দেখো, এমন কিছু যেন করে বসো না যাতে আমাদের এই জার্নির আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

—তুই চুপ্ কর্ তো। বলে ওঠে পরিতোষ, এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যদি ঐ মেয়েই হয় তা হলে তোর বিয়ের আগেই হনিমুন। কথাব শেষে পাশের ঘরে খাবাব জন্যে পরিতোষ ও বনানী খাট থেকে নেমে আসে।

ভেজানো দরজাব ওপর টোকা পড়তেই জবাব দিতে যায় উজ্জ্বলা। কিন্তু তার আগেই বাইরে জেগে ওঠে পবিতোষের কণ্ঠস্বর, ভেতরে আসবো?

পরিতোষের কণ্ঠস্বরে মেয়েরা সবাই হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা করে তাকে। আরে দাদা যে, আসুন—আসুন।

বনানীকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হাসিমুখে পরিতোষ বললে, কেবল দাদা নয়, বৌদিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তা, এতবড় লং জার্নিব পরে তোমবা কে কেমন আছো সেই খবব নিতেই এলাম।

—আমরা সবাই ও কে.। হেসে বলে ওঠে উজ্জ্বলা।

—হাণ্ড্রেড্ পার্সেণ্ট? খাটের ওপর জাঁকিয়ে বসতে বসতে পরিতোষ জিজ্ঞেস করে।

উজ্জ্বলা জবাব দেবার আগেই বলে ওঠে রীনা, হাঁা দাদা, আমবা সবাই হাণ্ড্রেড্ পার্সেণ্ট। কেবল ঐ জয়ন্তী নাইণ্টি নাইন পার্সেণ্ট।

—ওর বুঝি গায়ে, হাত পায়ে সামান্য ব্যথা হয়েছে? বলতে থাকে পরিতোষ, এতবড জার্নিতে তো এটুকু হতেই পাবে। ও কিছু নয়। দু'এক দিনেই সব ঠিক্ হয়ে যাবে।

—না দাদা, জবাব দেয় রীনা, ব্যথা গায়ে নয়, মনে।

—তার মানে?

ফিক্ করে বললে হেসে রীনা ও আপনি ঠিক্ বুঝবেন না, দাদা।

বৌদি বুঝলেও বুঝতে পারেন। যাকৃগে ওসব কথা, এখন বলুন আপনারা কেমন আছেন?

—ফার্স্টক্লাশ। হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছো। কেবল একজনই ফ্ল্যাট্।

—সঞ্জয়বাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নাকি? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলার।

হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, না, তেমন কিছু নয়।

হঠাৎ মায়া ওপাশ থেকে বলে ওঠে, তাঁরও কি তবে ঐ নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট?

মায়ার কথার ধরনে একটা হাসির রোল জেগে ওঠে ঘরের মধ্যে।

হাসি থামিয়ে বলতে থাকে পরিতোষ, নটিয়ালের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে আগামী কালও আমাদের লং জার্নি করতে হবে। সকাল আটটায় এখান থেকে রওনা হবো আমরা। সন্ধ্যায় গিয়ে পৌছবো গৌরীকুণ্ড। ওয়েদার যদি ভালো থাকে তা হলে পরশু সকালেই আমরা গৌরীকুণ্ড থেকে রওনা হবো কেদারের পথে।

—ওয়েদার যদি ভালো না থাকে তা'হলে কি কেদারে যেতে পারবো না? চিন্তিত কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলার।

গম্ভীর সুরে জবাব দেয় পরিতোষ, না, সেক্ষেত্রে আমাদের হয়তো কেদার দর্শনই হবে না।

—সেকি! একসঙ্গে চার কন্যার আর্ত কণ্ঠস্বর, এতদূর এসে কেদার দর্শন না করেই ফিরে যেতে হবে?

—হ্যাঁ হবে, বলতে থাকে পরিতোষ, নটিয়াল খবর পেয়েছে গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারের পথে নাকি দু'দিন ধরে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে কোন যাত্রীই যেতে পারেনি। ঐ রকম ব্যাড্ ওয়েদারে পায়ে হেঁটে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি ঘোড়াও যাবে না। কাজেই ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তবে, সবই বোঝা যাবে আগামী কাল গৌরীকুণ্ড যাবার পরে।

পরিতোষ থামতেই একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে ঘরের মধ্যে। এবার মুখ খোলে বনানী। বললে, এত চিন্তার কিছু নেই। আমাদের হাতে তো কালকের পুরো দিনটাই রয়েছে। পাহাড়ী আবহাওয়ার পরিবর্তন হতেও বেশি সময় লাগে না। নটিয়াল নিজেও তো সেই কথাই বললো। তা'ছাড়া—

—তা'ছাড়া কি? কৌতূহলী চোখে চার কন্যা একযোগে তাকায় বনানীর দিকে।

মৃদু হেসে বনানী কৃত্রিম দ্বিধার সুরে বললে, না থাক্। তোমরা ভাই

এযুগের মেয়ে। তোমরা হয়তো এসব বিশ্বাসই করবে না। কথাটা বলেই সে যেন সমর্থনের আশায় তাকায় পরিতোষের দিকে।

জবাবে পরিতোষ ব্যাপারটাকে যেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় বনানীর দিকে তাকিয়ে হাল্‌কা সুরে বললে, কি যে তোমার কাণ্ড! এসব কথা বলার আর কি আছে?

—না—না, বলুন না দাদা. আবদারের সুরে বলে ওঠে মেয়েরা, পরশু আমরা কেদারে যেতে পারবো?

সহসা মুখ-ভাবের পরিবর্তন ঘটে পরিতোষের। এতক্ষণের হাল্কা মুখে ফুটে ওঠে গাম্ভীর্য। চার কন্যার মুখের ওপর পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর সুরে বললে, হ্যাঁ পারবে।

—ঝড়-বৃষ্টি থাকবে না?

—না, কেটে যাবে।

—কি করে বললেন, দাদা? জিজ্ঞেস করে উজ্জ্বলা।

সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখে আবার হাল্কা ভাব ফুটে ওঠে পরিতোষের। একটু হেসে বললে, এমনিই বললাম।

বলে ওঠে রীনা, না দাদা, আপনার মুখই বলছে আপনি এমনি বলেন নি। এর পেছনে কোন কারণ আছে নিশ্চয়ই।

পরিতোষ কিছু জবাব দেবার আগেই বনানী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, বারে, এর মধ্যে লুকোচুরির কি আছে। বলেই দাও না।

তারপর বনানী আবার নিজেই বলতে থাকে, শোন তবে। আসলে কেদারে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবার খবরে আমরা সবাই খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। উনি তখন কাগজপত্রে কি সব ছক কেটে অনেকক্ষণ ধরে বিচার বিবেচনা করলেন। তারপর বললেন, কোন চিন্তা নেই। কেদার দর্শন আমাদের হবেই।

—দাদা কি জ্যোতিষীও জানেন নাকি? জিজ্ঞেস করে রীনা।

জবাব দেয় পরিতোষ, না—না. তোমাদের বৌদির কথায় কোন গুরুত্ব দিও না তোমরা। তেমন কিছু নয়। এই একটু-আধটু—

—হুররে! রীনা ও মায়া একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর নিজ নিজ হাত পরিতোষের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বললে, একটু দেখুন না, দাদা।

—উঁহু, বলে ওঠে পরিতোষ, আমি হাত দেখতে পারি না। আমি যা করতে পারি তা' হচ্ছে সামুদ্রিক বিচার।

—সেটা আবার কি?

—আর একরকম পদ্ধতি সেটা। তবে, যে মাসে যার জন্ম কেবল সেই মাসেই তার সামুদ্রিক বিচার করার পদ্ধতি আমি জানি।

—আমার তো জন্ম অক্টোবরে। রীনা বললে।

জবাব দেয় পরিতোষ, তা'হলে তো এখন তোমার হাতে বিচার করা চলবে না। আচ্ছা, তোমার জন্ম কি মাসে? মায়ার দিকে তাকায় পরিতোষ।

ম্লান স্বরে জবাব দেয় মায়া, জানুয়ারীতে।

—তা'হলে তো তোমারও হবে না।

একটু থেমে পরিতোষ উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তা'হলে এই জুন মাস কি তোমাদের কারুরই জন্মমাস নয়?

এবার জবাব দেয় জয়ন্তী, আমি জুন মাসে জন্মেছি।

—তা হলে তুমি এসো। তোমার হাতের সামুদ্রিক বিচারই করবো।

—দেখ কাণ্ড! বলে ওঠে রীনা, এই বোধহয় জগতের নিয়ম। যে চায় সে পায় না, আর যে চায় না তার ভাগ্যেই শিকে ছেঁড়ে।

রীনার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে জয়ন্তী পরিতোষের কাছে এসে তার দিকে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিতেই পরিতোষ বললে, না—না, মেয়েদের বাঁ হাত।

জয়ন্তী এবার তার বাঁ হাত বাড়িয়ে দেয়। পরিতোষ সেই হাতের দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে অবশেষে কাগজ-কলম নিয়ে লাইন টেনে কতগুলো চৌকো ছক্ আঁকতে থাকে।

—এগুলো কি? জিজ্ঞেস করে রীনা।

লাইন টানতে টানতে গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় পরিতোষ, এ তুমি বুঝবে না। সামুদ্রিক বিচার পদ্ধতি।

পরিতোষ এবার ঐ চৌকো ছকের মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যা বসিয়ে তারপর শুরু করে অঙ্ক কষতে। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, এমনকি স্কোয়ার রুট পর্যন্ত এনে ফেলে তার মধ্যে। আর ঘরে উপস্থিত মেয়েরা একদৃষ্টে দেখতে থাকে সেই সামুদ্রিক বিচার পদ্ধতি।

একসময় অঙ্ক কষা শেষ হয় পরিতোষের। কাগজ-কলম রেখে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, তোমার জন্ম তারিখ বোধহয় তের কিম্বা তেইশ, কেমন?

বিস্মিত জয়ন্তী মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, তেইশ।

বেশ একটু গর্বমিশ্রিত চোখে পরিতোষ উপস্থিত সকলের মুখের দিকে একবার তাকায়। বনানীর ওপর চোখ পড়তেই বনানীর ঠোঁটের কোণে একটু

হাসি ফুটে ওঠে। চোখের ইঙ্গিতে তাকে হাসতে বারণ করে পরিতোষ।

চার কন্যা অবাক্ চোখে দেখতে থাকে পরিতোষকে। কি আশ্চর্য, স্রেফ অঙ্ক কষেই তারিখ বলে দিলে? জয়ন্তী ছাড়া বাকি তিনজনের মনে তখন আফশোষ, ইস, এরকম একজন গণৎকারকে হাতের কাছে পেয়েও কেবলমাত্র জন্মমাসের হেব-ফেবের জন্যেই তারা নিজেদের হাত দেখতে পারছে না।

এর পরে পরিতোষ যা শুরু করলে তাতে সেই চারকন্যা কেবল অবাকই নয়, সোজাসুজি হতবাক। পরিতোষ সেই কাগজটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্তীকে বললে, তোমরা তো চার বোন, ভাই নেই, কেমন?

অভিভূত জয়ন্তী কেবল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—তোমার ওপরে দুই দিদি। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই না?

—আশ্চর্য, জয়ন্তীর বদলে রীনার বিস্মিত মন্তব্য, আচ্ছা দাদা ওর দিদিদের কোথায় বিয়ে হয়েছে বলতে পারেন?

—আলবৎ পারি, জবাব দেয় পরিতোষ। তারপর কাগজটার ওপর আর একবার তাকিয়ে জয়ন্তীকে বললে, তোমার বড়দি থাকে উত্তরের কোন পাহাড়ী রাজ্যে। ধর, দার্জিলিং, শিলং, গ্যাংটক। বল ঠিক্ কিনা?

জবাব দেয় জয়ন্তী, হ্যাঁ, বড়দি থাকে শিলং। জামাইবাবু সেখানে ইণ্ডিয়ান অয়েলের একজন অফিসার।

বীনার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার বলতে থাকে পরিতোষ, আর তোমার মেজদি থাকে কাছাকাছি। এই ধরো হাওড়া, শিবপুর, উলুবেড়িয়া—

—ঠিক্। পরিতোষের কথার মধ্যেই বলে ওঠে জয়ন্তী, উলুবেড়িয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আমার মেজ জামাইবাবু।

এবার কেবল বিস্ময়ই নয়, চার কন্যা একেবারে হতভম্ব। তাদের দিকে তাকিয়ে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে পরিতোষ জয়ন্তীর উদ্দেশে আবার বললে, ক্লাস নাইনের ছাত্রী তোমার ছোট বোন, কেমন ঠিক্ কিনা?

বিস্মিত জয়ন্তী এবার জবাব দিতেও ভুলে যায়। আবার বললে পরিতোষ, যাদবপুরের ছাত্রী তুমি। ফিলজফিতে অনার্স, কেমন?

ঘরের মধ্যে উপস্থিত মেয়েদের কারুর মুখেই কথা নেই। এমন একজন জ্যোতিষীকে তারা জীবনে এই প্রথম দেখলো। শুনেছিল বটে যে এদেশে যারা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাদের মধ্য থেকে একজন একনম্বরী মানুষকে বেছে বার করা নাকি ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ দিয়েও সম্ভব নয়। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারছে যে এই সংসারে ভূত—ভবিষ্যৎ—বর্তমান সম্পর্কে

সঠিক্ বলার মত মানুষ এখনও এক-আধজন অবশিষ্ট আছে। তবে তাদের এই সদ্যপরিচিত দাদাটি যে সেই বিরলদের একজন তা' কিন্তু তারা আগে বুঝতে পারেনি।

পরিতোষের স্টক্ কিন্তু তখনও ফুরোয়নি। সে আবার জয়ন্তীকে বললে, তিন অক্ষরে নাম তোমার বাবার। প্রথম অক্ষরটি প।

—হ্যাঁ, ঠিক্। বলে ওঠে রীনা, ওর বাবার নাম পরেশ রায়।

—তিনি চাকরি করেন না। ইট—কাঠ—সিমেণ্ট—বালির ব্যবসা করেন তিনি। বোধ হয় কণ্ট্রাক্টর কিম্বা ঐ জাতীয়—।

পরিতোষের কথার মধ্যেই জবাব দেয় রীনা, হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছেন। ওর বাবা একজন কণ্ট্রাক্টর।

এতক্ষণে পরিতোষ সোজা হয়ে বসে বলে ওঠে, না, আজ থাক্। আবার একদিন হবে। কথার শেষে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আটটা বাজতে চলেছে। এতক্ষণে বোধহয় কিচেনে ডিনার রেডি। নটিয়াল বলেছে কাল আর্লি মর্নিংয়ে আমাদের বেরোতে হবে।

পরিতোষের কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রীনা খাট থেকে নেমে ছুটে এসে জয়ন্তীর হাতটা চেপে ধরে বলে ওঠে, না দাদা, থামলে চলবে না। জয়ন্তীর বিয়ের ব্যাপারে কিছু না বললে আপনাকে রেহাই দিচ্ছি না।

রীনার দিকে একটা কটাক্ষ হেসে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে তাকে ধমকে ওঠে জয়ন্তী, এই রীনা, কি ইয়ার্কি হচ্ছে ?

—ইয়ার্কি কি ? জবাব দেয় রীনা, আমাদের দাদা একজন গুণী ব্যক্তি। সুযোগ যখন পেয়েছিস তখন নিজের বিয়ের ব্যাপারটা চটপট্ জেনে নে, বোকা মেয়ে। আমি হলে তো সব ছেড়ে আগে ওটাই জেনে নিতাম। কপাল খারাপ, নইলে কি জন্ম মাসটা এমন গোলমাল করতে পারতো ?

কথার শেষে জয়ন্তীর হাতটা একরকম জোর করে পরিতোষের সামনে মেলে ধরে অনুনয়ের স্বরে রীনা আবার বললে, বলুন না দাদা, ওর বিয়ের কথা কিছু বলুন।

রীনার পীড়াপীড়িতে পরিতোষের মুখে একটু বিব্রত ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। আসলে তার স্টক শেষ। সঞ্জয় যতটুকু খবর তাকে দিয়েছিল তা' দিয়েই সে এতক্ষণ মেয়েদের রেখেছিল মন্ত্রমুগ্ধ করে। এর বেশি কিছু বলতে গেলেই তো আন্দাজে ঢিল। আর তাতেই এতক্ষণের জারিজুরি সব খতম। কিন্তু উপায় নেই। রীনা মেয়েটা যেমনি নাছোড়বান্দা তেমনি বিচ্ছু। ওর হাত এড়ানো ভারি শক্ত।

একটা ঢোক গিলে সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করে জয়ন্তীর হাতটা আবার টেনে নেয় পরিতোষ। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করে, ঠিক্ আছে। বিয়ের ব্যাপারে কি জানতে চাও চট্‌পট্ বলে ফেল।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় জয়ন্তী, আমি কিছুই জানতে চাই না।

—বেশ তো, আমি চাই। রীনার সকৌতুক জবাব।

একটু সময় চিন্তা করে পরিতোষ আবার বললে, বিয়ের ব্যাপারে এমন আর কি বলবো ? বিয়ে ওর হবে।

—বিয়ে তো হবেই, বলে ওঠে রীনা, ও যে চিরকাল যোগিনী হয়ে থাকবে না তা আপনি না বললেও আমরা জানি। আমি কেবল জানতে চাইছি কেমন বিয়ে হবে, কোথায় হবে, কবে হবে ?

কাগজটার ওপর চোখ রেখে পরিতোষ বললে, শিগ্‌গিরই হবে। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাছি ওর বাবা খুবই চেষ্টা করে চলেছেন। খবরের কাগজ দেখে এখানে ওখানে ওর জন্মছক্ পর্যন্ত পাঠাচ্ছেন।

পরিতোষের কথায় রীনার চোখজোড়া হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়। তার ঠোঁটের কোণে দেখা দেয় একটু হাসি। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসিটুকু লুকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন দাদা যে ওর বাবা এখানে ওখানে ওর জন্মছক পাঠিয়ে চলেছেন ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় পরিতোষ। রীনা এবার হালকা সুরে জিজ্ঞেস করে, কিভাবে দেখতে পাচ্ছেন, দাদা ? দিব্যদৃষ্টিতে নাকি ?

রীনার প্রশ্নের ধরনে একটু থতমত খায় পরিতোষ। তারপর আমতা আমতা করে বললে, তা' কেন ? সামুদ্রিক বিচারেই—।

পরিতোষ কথাটা শেষ করার আগেই পাশের খাট থেকে মায়া জিজ্ঞেস করে, নিগোসিয়েবল্ ম্যারেজ, নাকি লাভ ম্যারেজ, দাদা ?

বিব্রত পরিতোষ সহসা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। আর সেই সুযোগে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে ওঠে রীনা আমি কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, দাদা।

রীনার কথায় ঘরে উপস্থিত মেয়েদের এবার অবাক্ হবার পালা। রীনা কি বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে সবাই একযোগে তাকায় তার দিকে। বলতে থাকে রীনা, এখানে-ওখানে নয়, যে সব পাত্রের মা-বাবাদের জন্মছকের ওপর অগাধ বিশ্বাস কেবল সেখানেই ওর বাবা জন্মছক্ পাঠাচ্ছেন। যেমন, কিছুদিন আগে এমন একজন পাত্রের বাড়িতে ছক্ পাঠিয়েছেন যে পাত্রটির নামের আদ্যাক্ষর 'স'।

—'স'? পরিতোষ শব্দটির পুনরাবৃত্তি করে।

মাথা নেড়ে বলতে থাকে রীনা, হ্যাঁ। পাত্রটি কিন্তু চমৎকার। ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যাদবপুর থেকে ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর জোকার ইণ্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট ইন্সস্টিটিউট্ থেকে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে—।

রীনার কথার মধ্যেই বলে ওঠে উজ্জ্বলা, তাই নাকি। আমাদের দাদার ঐ ভাগ্নে সঞ্জয়বাবুও তো ইলেক্ট্রনিক—। উজ্জ্বলার কথা শেষ হবার আগেই খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে বনানী। ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝতে পেরে পরিতোষ পালিয়ে যাবার চেষ্টায় খাট থেকে তাড়াতাড়ি নামতে চেষ্টা করতেই সে ধরা পড়ে যায় রীনার হাতে। তার একটা হাত শক্ত মুঠোয় ধরে হাসতে হাসতে বলতে থাকে রীনা, ওকি দাদা, পালাচ্ছেন কোথায়? আপনার সামুদ্রিক বিচার—। হাসির দমকের মধ্যে তার পরের কথাগুলো চাপা পড়ে যায়।

ধরা পড়ে গিয়ে চাপা হাসি ফুটে ওঠে পরিতোষের মুখে। হাসতে থাকে বনানীও। আর রীনার মুখে তো হাসির ফোয়ারা। বিষয়টি সঠিক বুঝতে না পেরে উজ্জ্বলা ও মায়া এসে দাঁড়ায় রীনার কাছে।

হাসতে হাসতে বলতে থাকে রীনা, প্রথমদিকে দাদার কথায় আমিও অবাক্ হয়েছিলাম। দাদার ঐ সামুদ্রিক বিচার পদ্ধতির ওপর আমারও প্রচণ্ড শ্রদ্ধা জন্মেছিল। কিন্তু জয়ন্তীর বিয়ের ব্যাপারে দাদার কথাবার্তায় কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়েছিল আমার। কিন্তু পাত্রের বাড়িতে জন্মছক পাঠাবার কথাতেই আমি ধরে ফেললাম যে দাদা আমাদের স্রেফ গুল্ দিচ্ছেন। জন্মছকের সঙ্গে মেশোমশাই অর্থাৎ জয়ন্তীর বাবা তাঁর নিজের পরিবার সম্পর্কে ঐ সঞ্জয়বাবুদের কাছে যা জানিয়ে ছিলেন, আমাদের দাদা এখানে ঠিক তাই বলেই আমাদের অবাক করে দিয়েছেন।

রীনার ব্যাখ্যায় ঘরের মধ্যে আবার একটা হাসির রোল জেগে ওঠে। এবার তার শরীক উজ্জ্বলা ও মায়াও। জয়ন্তীর অবস্থা কিন্তু সেইমুহূর্তে বাস্তবিকই করুণ। বেচারীর কানদু'টো ততক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। সেই লজ্জা ঢাকতে সে তাড়াতাড়ি নিজের বাক্সটা খুলে শুধু শুধু কাপড় চোপড় নাড়াচাড়া করতে থাকে।

বলে ওঠে উজ্জ্বলা, সত্যি, আশ্চর্য যোগাযোগ!

এই সময় মায়া বললে, শেষ পর্যন্ত জয়ন্তীর ম্যারেজ যদি ঐ সঞ্জয়বাবুর সঙ্গেই হয় তা'হলে ব্যাপারটাকে কী বলা হবে? নিগোশিয়েবল্ ম্যারেজ, না লাভ ম্যারেজ?

হাসতে হাসতে জবাব দেয় রীনা, নিগোশিয়েবল লাভ ম্যাবেজ।

(তিন)

পুবো নাম বি. কে. মজুমদাব। কথাবার্তা ও চালচলনে একদম পুবোদস্তব সাহেব। এককালে নামী সাহেব কোম্পানীতে চাকবি কবতেন। অফিসাব ব্যাঙ্কেই ছিলেন। বিলেত অবিশ্যি কখনও যান নি। তবে চার্কাবতে থাকাকালান একবাব সেখানে যাবাব সম্ভাবনা দেখা দিয়োছল। শেষপর্যন্ত অবশ্য আব যাওয়া হয়নি। সেই দুঃখ আজও মনে মনে পোষণ কবেন তিনি। তাঁব এই চবিত্রেব জন্যেই পাড়ার লোকের কাছে তিনি 'মজুমদার সাহেব' নামে পবিচিত। আব এই 'সাহেব' সম্বোধনে তিনি যে খুঁশি হন এই খববটা বে-পাড়ার ছেলে-ছোক্‌বাবা পর্যন্ত জেনে গেছে বলেই পুজো-পার্বনেব চাঁদা ইত্যাদি আদায় কবতে এসে এই অস্ত্র প্রযোগেই তাবা চেষ্টা কবে মজুমদার সাহেবকে ঘায়েলকবতে।

চাকবিতে থাকাকালীন বাডিব ঝি-চাকব তাঁকে 'বাবু' বলে সম্বোধন কবলে তিনি বীতিমত চটে উঠ্‌তেন। এমনকি একবাব চেষ্টাও কবেছিলেন তাদেব দিযে স্ত্রী সাবিত্রীকে 'মেমসাহেব' সম্বোধন্ কবাতে। সেদিন কিন্তু বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন সাবিত্রী। এমনিতে খুবই শান্ত প্রকৃতির মহিলা তিনি। নিজে সহসা চটেন না এবং পাবত পক্ষে কাউকে চটাতেও চান না। চিবকালই মজুমদাব সাহেব তাঁব ওপর দাপট দেখিয়ে এসেছেন এবং তিনিও মুখবুজে তা' সহ্য কবেছেন। সামান্যতম প্রতিবাদ পর্যন্ত কবেন নি কোনদিন। কেবল ঐ মেমসাহেবেব ব্যাপাবেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হযে সবব হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, এ কেমন কথা ? বাঙ্গালী ঘবেব বউ আমি। কোথায সবাই 'মা' বলে ডাকবে, তা' নয় 'মেমসাহেব'। আমি কোন্ দুঃখে ঐ মেমসাহেব হতে যাবো ? আমি কি তাদেব মত স্কার্ট্ পবি নাকি বব্ কবে চুল কাটি যে মেমসাহেব হবো ?

স্ত্রীব এমনি হঠাৎ বিদ্রোহী মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না মজুমদাব সাহেব। তাই প্রথমটায় একটু ঘাব্‌ডে গিয়েছিলেন তিনি। যতই কেন না হট্ টেম্পারড্ মানুষ হোন্, আসলে তিনি একটু ভীতু প্রকৃতিব। বিশেষ কবে, নিজেব দাপট ও সংসারেব শান্তি বজায় রাখতে হলে হোম-ফ্রন্ট্ অর্থাৎ গৃহিনীকে চটানো যে ঠিক্ নয়, সেই বোধ তাঁব টনটনে। তাই পশ্চাদপসবণ কবতে গিয়ে সেদিন একটু শুক্‌নো হাসি হেসে বলেছিলেন তিনি, স্কার্ট্ আর বব্‌চুল না থাকলে বুঝি মেমসাহেব হওয়া যায় না ? বিলেতে—।

—রাখো তো তোমার বিলেত, বলে উঠেছিলেন সাবিত্রী, তুমি তোমার ইচ্ছেমত টেকা, সাহেব, গোলাম যা খুশি তা-ই হও গিয়ে, আমাকে ঐ বিবি, মেমসাহেব হতে বলো না।

ছি—ছি, শেষে কিনা গোলাম! স্ত্রীর কথায় সেদিন আত্মসম্মানে জোর আঘাত লাগলেও এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস করেন নি মজুমদার সাহেব। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে সাহেব হয়ে থাকলেও সাবিত্রীকে আর মেমসাহেব করা হয়ে ওঠেনি।

মজুমদার সাহেব যে এককালে সুপুরুষ ছিলেন তা' তাঁর এই বাষট্টি বছর বয়সের চেহারাতেও স্পষ্ট। প্রায় ছ'ফুট লম্বা চাবুকের মত টানটান তাঁর দেহখানি ইদানীং বয়সের ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। তীক্ষ্ণ নাক, মোটা ভুরু, মাথা জুড়ে বিরাট টাক। তাঁর বরাবরের মোটাসোটা গোঁফজোড়াকেই সাদা চুলগুলোর অসুন্দরকে বিদায় জানাতে খোদ গোঁফজোড়াকেই তিনি বর্তমানে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভারি গম্ভীর কণ্ঠস্বর। স্ত্রীর মত তাঁর একজোড়া ছেলে-মেয়েও মজুমদার সাহেবকে সর্বদাই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। একমাত্র ছেলে যাদবপুরের ফার্স্টক্লাস ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয়এই বয়সেও বাপের সামনে মুখ তুলে কথা বলার সাহস পায় না।

সাহেব পরিচয়ে মজুমদার সাহেবের আত্মপ্রচারের প্রচেষ্টা যতই থাক্ না কেন, মনের দিক থেকে তিনি এখনও কিন্তু বাস করছেন সেই সাবেকী যুগে। স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে চাকরি করাকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এদেশে জনসংখ্যার হার কমানোর যৌক্তিকতা মেনে নিলেও মেয়েদের বন্ধ্যাকরণের ঘোর বিরোধী তিনি। মুখে স্বীকার না করলেও রূপ কানোয়ারের সহমরণে "সতী" হবার ঘটনাকে তিনি মনে মনে সমর্থনই করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ করে কোষ্ঠি-ঠিকুজি বিচারের ওপর অস্বাভাবিক বিশ্বাস ও দুর্বলতা মজুমদার সাহেবের। নিজের একমাত্র কন্যা রশ্মির জন্যে ভালো-ভালো পাত্র হাতে পেয়েও কেবলমাত্র কোষ্ঠি-ঠিকুজির অমিলের ওজুহাতে সবগুলোই হাতছাড়া করেছিলেন তিনি। আত্মীয়-পরিজনদের পরামর্শ তো বটেই এমনকি স্ত্রী সাবিত্রীর অনুরোধেও তিনি কান দেননি। বলেছিলেন, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররাই তো পৃথিবীর মানুষকে পরিচালনা করে। ওদের প্রভাবেই যখন এই জগতে কেউ আমীর, কেউ ফকীর তখন আমার রশ্মির সঙ্গে যার রাজযোটক হবে সেই পাত্রকেই আমি বেছে নেব। এজন্যে যদি রশ্মির বিয়ে দশ বছর পিছিয়ে যায় তাতেও আমি পেছপা হবো না। কেবল রাজযোটক হলেই চলবে না, কোষ্ঠির মিল শতকরা একশ ভাগ হওয়া চাই।

এমনকি নিরানব্বই ভাগ হলেও চলবে না।

শেষপর্যন্ত কিন্তু রশ্মির জন্যে তেমন একটি পাত্রই জোগাড় করেছিলেন মজুমদার সাহেব। পারিবারিক অবস্থা তেমন ভালো না হলেও ডাক্তারীর কৃতী ছাত্র চিন্ময়। অবশ্যি পাত্রটির জন্যে একটা মোটা টাকা খরচ করতে হয়েছিল মজুমদার সাহেবকে। নগদ পণ হিসেবে না হলেও চিন্ময়েব প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিসের চেম্বারের সেলামীর তিরিশ হাজার টাকা তাঁকেই দিতে হয়েছিল। এ নিয়ে চিন্ময়ের বাবার সঙ্গে একটু মন কষাকষি হলেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন নি মজুমদার সাহেব। এত চেষ্টার পরে যখন এমন একশ ভাগ রাজযোটকের মিল একটি পাত্র পাওয়া গেছে তখন এটিকে হাত ছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলে মনে করেছিলেন তিনি। অনন্যোপায় মজুমদার সাহেব টাকাব অঙ্কটা কিছু কমাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতেও তিনি সফল হন নি। চিন্ময়ের বাবা অদ্ভুত এক যুক্তির অবতারণা করে বলেছিলেন, এ আপনি কি বলছেন? মাত্র তো তিরিশ হাজার টাকা। ছেলেকে ডাক্তার বানাতে কয়েক লাখ টাকা খরচ করেছি আমি। সেই ছেলে আপনাব মেয়েব সঙ্গে সংসার পাতবে। সেখানে আপনার মেয়ের শেয়ার হিসেবে মাত্র তিরিশ হাজাব টাকা আপনি খরচ কববেন না?

এমন যুক্তির পরে মজুমদার সাহেব আর কিছু বলতে পারেন নি। মনে মনে হয়তো বলেছিলেন, তাঁর ভাগ্য ভালো যে চিন্ময়েব বাবা ছেলের লেখাপড়ার কয়েক লক্ষ টাকার আধাআধি শেয়ার দাবী করে বসেনি। শেষ পযন্ত বিয়ের আগেই মজুমদার সাহেবকে কড়কড়ে তিরিশটি হাজাব টাকা তুলে দিতে হয়েছিল চিন্ময়ের বাবার হাতে। একটি পয়সাও কম নেন নি তিনি।

জামাতাটি কিন্তু সত্যিই ভালো হয়েছিল মজুমদার সাহেবেব। একটু উন্নাসিক প্রকৃতির হলেও স্বভাব-চরিত্র খুবই ভালো। অতি অল্প দিনেই বেশ পসার করে ফেলেছিল সে। মেয়ে রশ্মি তার স্বামীর কাছে সুখেই আছে। মাঝে মাঝেই গাড়ি চেপে এসে মা-বাবার খোঁজ নিয়ে যেতে ভোলে না। মেয়ের বিয়ের যাবতীয় খরচ পত্রের ওপর ঐ অতিরিক্ত তিরিশ হাজারের কাঁটা কিন্তু এখনও মাঝে-মধ্যে মনে খচ্‌খচ্‌ করে মজুমদার সাহেবের। সাবিত্রী কিন্তু বলে অন্য কথা। বলে, মেয়ে যখন তোমার ভালো পাত্রের হাতে পড়ে সুখে আছে তখন ও নিয়ে মন খারাপ করে আর কি হবে? পাঁচটা নয়, একটা তো মাত্র মেয়ে তোমার।

তা' ঠিক। দায় বলতে মাত্র এই একটাই দায় ছিল মজুমদার সাহেবের— কন্যাদায়। সেই দায় মিটিয়ে ফেলেছেন তিনি। হিসেবের বাইরে তো কেবল

ঐ তিরিশ হাজার। তা, ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলে ঐ তিরিশ হাজার সুদে আসলে উশুল হওয়া এমন কি অসম্ভব ব্যাপার? কৃতী একমাত্র পুত্র সঞ্জয় নিজেই তো ঐ তিরিশ হাজারের এক মস্ত গ্যারান্টি ।ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট এবং তারপরেও জোকার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ সঞ্জয় এক জাপানী কোলাবোরেশন কোম্পানী থেকে ট্রেনি আফসার হিসেবেই যে অঙ্কের অফার পেয়েছে তা' এদেশে অনেকে চিন্তাই করতে পারে না। দিল্লীতে ছ'মাস ট্রেনিংয়ের পবে বম্বেতে যখন পোস্টিং হবে তখন সেই টাকাব পরিমাণ আরও বাড়বে। মেয়ের বিয়ের অতিরিক্ত খরচ ছেলের মোটা মাইনের টাকায় অনায়াসেই উশুল হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, খরচ আবও আছে। ছেলেব বিয়ের খবচ। আজকাল ছেলেব বিয়ের খরচ মেয়ের বিয়ের খরচের চাইতে তেমন কিছু কম নয়। তবে ভরসা এই যে মেয়ে-বিয়েব দায় যেমনি সম্পূর্ণ একার, ছেলে-বিয়ের দায়িত্বের ভাগ গ্রহণ করতে অনেক সময় পাত্রীব বাপও এগিয়ে আসেন।

সঞ্জয়ের বিয়েব কথায় সাবিত্রী একটু চমকে উঠে বলেছিলেন, সে কি, তোমাব ছেলে সবে লেখাপড়া শেষ করলো। এখনও চাকবিই শুরু করলো না। এর মধ্যেই তার বিয়ের কথা ভাবতে আবস্ত করলে?

একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে জবাব দেন মজুমদার সাহেব, দিনকাল বড়ই খারাপ। মেয়েই বল, আব ছেলেই বল, তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়াই আজকাল বুদ্ধিমানের কাজ। কে যে কোথায় কি কবে বসবে তার ঠিক্ কি?

একটু চিন্তা করে বলেছিলেন সাবিত্রী, তা' বাপু তুমি যা-ই বলো না কেন, আমার সঞ্জু তেমন কিছু করে বসবার ছেলেই নয়। এখনও সে 'মা' বলতেঅজ্ঞান।

—যা বলেছ, বলতে থাকেন মজুমদার সাহেব, তবে তেমন মেয়েব পাল্লায় পড়লে জ্ঞান ফিরে আসতেও কিন্তু সময় লাগে না। একালের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঐ প্রেম-ট্রেম যে কি সাংঘাতিক বস্তু তা' তো তুমি জানো না। আর জানবেই বা কেমন করে? তোমার বাবা তো তেমন সুযোগ তোমাকে দেন-ই নি। ষোলয় পা দিতে না দিতেই তো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কথার শেষে হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন মজুমদার সাহেব।

ফোস্ করে উঠেছিলেন সাবিত্রী স্বামীর কথায়। বলেছিলেন, মোটেই না। আমার বাবার ভারি দায় পড়েছিল। নন্তু মাসির বিয়েতে আমাকে দেখে তোমার বাবাই তো পছন্দ করে আমাব বাবাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। নইলে ঐ বয়সে কি কারুর বিয়ে হয়?

প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই জাতীয় সরস আলোচনার মাধ্যমে অতীত রোমন্থন।

উপলক্ষ পুত্রের বিয়ের প্রসঙ্গ। ঐ প্রসঙ্গেই তাঁদের ফেলে আসা মধুর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ।

মুখটিপে হেসে মজুমদার সাহেব আবার বলেছিলেন, ভাগ্যিস ঐ বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল, নইলে—।

—নইলে কি? ভ্রু কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন সাবিত্রী।

—না—না, তেমন কিছু নয়। তবে ঐ বয়সে দেখতে তুমি ভারি সুন্দরী ছিলে কিনা।

স্বামীর কথার অর্থটুকু বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসেছিলেন সাবিত্রী। তারপর বলেছিলেন, তোমার বাবাই বা তোমার জন্যে সেদিন অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কেন?

—কেন, কি করে বলবো? এতকাল পরে সেসব কথা কি আর মনে আছে? আজ যেমনি সঞ্জুর ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করছি সেদিন আমার সম্পর্কেও হয়তো তিনি তেমন আশঙ্কা করেছিলেন।

—বুঝেছি—বুঝেছি, স্বামীর দিকে একটা কটাক্ষ হেনে বলেছিলেন সাবিত্রী. সেই অমলা মেয়েটাকে নিয়েই বোধহয় তোমার বাবা চিন্তিত হয়েছিলেন।

—অমলা? সে আবার কে? বিস্ময় প্রকাশ পায় মজুমদার সাহেবের কণ্ঠে।

—বারে, ভুলেই গেলে সেই অমলাকে? তোমাদের দু'টো বাড়ির পরেই তো সে থাকতো। তুমি নিজেই তো একদিন বলেছিলে তার কথা।

একটু চিন্তা করে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন মজুমদার সাহেব, ওহো, সেই হার্ডগিলের মত দেখতে মেয়েটার কথা বলছো? বাব্বাঃ, বেশ মনে রেখেছ তো। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে আমরা তো সেই মেয়েটার পেছনে লাগতাম। এই নিয়ে একবার মেয়েটার দাদার হাতে মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিলাম। সেই মেয়ের সঙ্গে প্রেম! হো—হো করে হেসে উঠেছিলেন মজুমদার সাহেব। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আবার বলেছিলেন, ওসব কথা এখন থাক্। সঞ্জুর কথা বলো।

—ওর কথা আর কি বলবো? বলেছিলেন সাবিত্রী, আমি ভাবছি সঞ্জু কি এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে?

সাবিত্রীর কথায় সাহেবী মেজাজ আবার ফিরে আসে মজুমদার সাহেবের। গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন তিনি, কি বললে? আমার অবাধ্য হবে সঞ্জু?

—না তা' হয়তো হবে না, তাড়াতাড়ি বলেছিলেন সাবিত্রী, তবে তোমার নিজেরও তো একটা দায়িত্ব আছে।

—হ্যাঁ, জবাব দিয়েছিলেন মজুমদার সাহেব, দায়িত্ব আছে বলেই তো

একমাত্র ছেলের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই।

একটু থেমে মজুমদার সাহেব আবার বলেছিলেন, তা' ছাড়া, আমি চাইলেই যে তাড়াতাড়ি একটি সুলক্ষণা পাত্রী জোগাড় হয়ে যাবে তার তো কোন স্থিরতা নেই। দেখতে সুন্দরী হলেই তো কেবল চলবে না, সঞ্জুর সঙ্গে রাজযোটক হওয়া চাই। পাত্রী নির্বাচনের প্রথম সর্তই তো কোষ্ঠি-ঠিকুজির শতকরা একশোভাগ মিল। তারপরে অন্যকিছু।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে বলেছিলেন সাবিত্রী, যাক, তবে বাঁচা গেল।

—তার মানে? স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান মজুমদার সাহেব।

তেমনি হাসিমুখে বলতে থাকেন সাবিত্রী, মানে এই যে কমপক্ষে একটি বছরের মধ্যে সঞ্জুর আর বিয়ের সম্ভাবনা নেই। কোষ্ঠি-ঠিকুজির মিল খুঁজতে খুঁজতেই তো তোমার একটি বছর পার হয়ে যাবে। আমাদের রঞ্জুর বেলায় যা ঘটেছিল সঞ্জুর বেলায়ও ঠিক্ তাই ঘটবে। কত ভালো ভালো পাত্র হাত ছাড়া করলে কেবল ঐ কোষ্ঠি ঠিকুজির অমিলের জন্যে। শেষে কিনা—

স্ত্রীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠেছিলেন মজুমদার সাহেব, কেন, পাত্র হিসেবে আমাদের চিন্ময় কি খারাপ?

—না—না, তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছিলেন সাবিত্রী, সত্যিই ভালো ছেলে চিন্ময়। এই বয়সেই ডাক্তারীতে কত নাম করেছে। রঞ্জুও সেখানে সুখেই আছে। আমি সে কথা বলছি না, বলছি যে ঐ কোষ্ঠি-ঠিকুজির মিলের জন্যে কতই না উদ্বেগের মধ্যে আমাদের কাটাতে হয়েছিল। আবার এই সঞ্জয়ের বেলায়ও হয়তো তাই ঘটবে।

—তাই বলে কোষ্ঠি বিচার না করিয়ে একটা মেয়েকে ধরে এনে সঞ্জুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শেষে ওর জীবনটাকে বরবাদ করবো?

মজুমদার সাহেব এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন কোষ্ঠি বিচার না করিয়ে যাদের বিয়ে-শাদি হয় তাদের প্রত্যেকের জীবনই যেন বরবাদ হয়ে যায়।

স্বামীর চরিত্রের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত সাবিত্রী। মজুমদার সাহেব যে কোষ্ঠি বিচারের বাইরে একপা যাবেন না তা' তিনি জানেন। তাই এই প্রসঙ্গে না গিয়ে তিনি কেবল বললেন, বেশ তো, চেষ্টা শুরু করো। দেখা যাক্ কত তাড়াতাড়ি তেমন একটি পাত্রী জোটাতে পারো।

এর পরেই খবরের কাগজে ছাপা হলো মজুমদার সাহেবের দেয়া 'পাত্রী চাই'—এর বিজ্ঞাপন। কোষ্ঠি-ঠিকুজির মিলটাই যে আসল সে কথাও স্পষ্ট করে ছাপা হলো বিজ্ঞাপনে। সেই সঙ্গে বারণ করা হলো পাত্রীর ছবি

পাঠাতে। বলা হলো, কোষ্ঠির মিল হলে যোগাযোগ করা হবে।

এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হাতে পেলেন মজুমদার সাহেব। ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ও সেই সঙ্গে জোকার ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি। তারওপর বাপের একমাত্র ছেলে ও কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। এমন একটি পাত্রের জন্যে মজুমদার সাহেবের বাড়িতে পাত্রীর বাবাদের চিঠির যে ঢল নামবে তাতে আর আশ্চর্য কি? গোছা গোছা চিঠি আসতে শুরু করলো মজুমদার সাহেবের নামে। বারণ সত্ত্বেও দু চারটি পাত্রীর অতি উৎসাহী বাবারা পাত্রীর জন্ম ছকের বদলে ফটো পাঠিয়ে দিলে। ভাবখানা এই যে তাদের কন্যাদের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পাত্রপক্ষ হয়তো জন্ম ছকের জন্যে আর পীড়াপীড়ি নাও করতে পারে।

রাশি রাশি চিঠি, জন্ম ছক ও দু চারখানা পাত্রীর ছবি। একা হাতে সেগুলো সামাল দিতে গিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন মজুমদার সাহেব। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার মত একজনের চিঠির সঙ্গে আর একজনের জন্মছক মিশিয়ে দিয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলতে লাগলেন। এদিকে এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার মত দ্বিতীয় কোন প্রাণী এই বাড়িতে নেই। সঞ্জয়কে তো আর এই কাজে হাত লাগাতে বলতে পারা যায় না। আর আছেন স্ত্রী সাবিত্রী। তিনি তো তার সংসার নিয়েই রাতদিন মেতে আছেন। কন্যা রশ্মি অবশ্য মাঝে মাঝে এবাড়িতে আসে, তবে তা তো মাত্র দু এক ঘণ্টার জন্যে। আর চিন্ময় তো ন মাসে ছ মাসে। কাজেই এই চিঠির পাহাড় নিয়ে একাই মজুমদার সাহেবকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। বাবার দুরবস্থায় কাতর হয়ে একদিন রশ্মিই একটা ভালো পরামর্শ দিলে মজুমদার সাহেবকে। বললে, শোন বাবা, এভাবে হবে না। তুমি একটা চার্ট তৈরি করে প্রথমে। সেই চার্ট দেখে তারপর বিচার করো কোন্ পাত্রীটি কি রকম।

কন্যার পরামর্শে পথের সন্ধান পেলেন মজুমদার সাহেব। তার বাইরের ঘরে মস্তবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল জুড়ে বিছিয়ে দিলেন বড় সাইজের একখানা কাগজ। ঘর কাটলেন সেই কাগজে। তারপর একে একে লিখে চললেন পাত্রীর নাম—বাবার নাম—ঠিকানা—পাত্রীর লেখাপড়ার বিবরণ—বয়স—জন্মছক আছে কি নেই ইত্যাদি। প্রায় প্রতিদিনই দু চারখানা করে চিঠি আসে, আর অফিসের অ্যাকুইট্যান্স রোল লেখার মত পাত্রীর যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় সেই কাগজে।

মজুমদার সাহেবের কাণ্ড দেখে একদিন সঞ্জয় হেসে সাবিত্রীকে বললে, বাবা যে দেখছি তার বসার ঘরখানাকে একটা রীতিমত অফিস বানিয়ে

ফেলেছেন!

—অফিস? কিসের অফিস? সাবিত্রী কৌতূহলী চোখে তাকান সঞ্জয়ের দিকে।

তেমনি হেসে জবাব দেয় সঞ্জয়, , প্রজাপতি অফিস!

হেসে বলে ওঠেন সাবিত্রী, তোর বাবার কাণ্ড! এরমধ্যে রশু একদিন এসে কি সব পরামর্শ করলো বাপের সঙ্গে। তারপরেই উনি কাগজপত্র নিয়ে বসলেন ঐ ঘরে।

---রীতিমত কম্পারেটিভ চার্ট, মা। বলতে থাকে সঞ্জয়, একটি পাত্রীর সঙ্গে আর একটি পাত্রীর তুলনা। কাগজের শেষ ঘরে দেখলাম পাত্রীর জন্ম-ছক্ পাঠিয়েছে কিনা তা-ই লেখা রয়েছে। এবার বোধহয় ঐ ছক্‌গুলো সব চালান হয়ে যাবে বাবার সেই জ্যোতিষীর কাছে।

—তা তো যাবেই, জবাব দেন সাবিত্রী, জন্মছক্ ছাড়া যেমনি রশুর পাত্র ঠিক হয়নি, তেমনি তোরও পাত্রী ঠিক্ হবে না।

—সর্বনাশ! বলে ওঠে সঞ্জয়, গুণে দেখলাম প্রায় শ'দেড়েক পাত্রীর জন্মছক্ পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকের ছক্ বিচার করাতে তো জ্যোতিষীকে মোটা টাকা দিতে হবে। কথার শেষে সঞ্জয় চোখ বড় করে তাকায় তার মায়ের দিকে।

একটু সময় চিন্তা করেন সাবিত্রী। তারপর বললেন, বোধহয় না। একসঙ্গে এতগুলো ছক্ পাঠাবেন না। সবকিছু বিচার করে যে কটি পাত্রীকে ওঁর মনে ধরবে কেবল সেই প্রথম বাছাই পাত্রীদের ছক্‌গুলোই পাঠাবেন। তার মধ্যে যদি কারুর সঙ্গে মেলে তো পাত্রীর ছবি আনাবেন। শেষে পাত্রী দেখবেন। না মিললে দ্বিতীয় বাছাই। তারপরে তৃতীয়।

—এভাবেই বুঝি এক একটি লট জ্যোতিষীর কাছে যাবে? এসব নিশ্চয়ই ঐ রশুটার বুদ্ধি।

একটু হেসে সাবিত্রী বললেন, কি জানি বাপু, তোর পাত্রী বাছাই নিয়ে বাপ-মেয়েতে মিলে যা শুরু করেছে –। কথাটা শেষ না করেই তিনি উঠে যান সেখান থেকে।

পাত্রী বাছাই ও তার পদ্ধতি নিয়ে মজুমদার সাহেবকে কিছু বলার সাহস নেই সঞ্জয়ের। তাই একদিন রশ্মিকে হাতের কাছে পেয়ে মুখটিপে হেসে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, কিরে তোদের পাত্রী বাছাইয়ের কতদূর?

সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয় রশ্মি, কেন রে দাদা, তোর বুঝি আর তর সইছে না?

—না—না, তা' নয়, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সঞ্জয়, ঠিক্ উল্টোটাই চাইছি আমি। আজ হোক্ কাল হোক্ বিয়ে যখন করতেই হবে তখন দুদিন সবুর করলে কি ক্ষতি হতো? আগে ট্রেনিংয়ে যাই, চাকরিতে জয়েন করি, তারপর না হয় – কথাটা অসমাপ্ত রেখেই চুপ্ করে সঞ্জয়।

এসব আমাকে বলছিস্ কেন? জবাব দেয় রশ্মি, সাহস থাকে তো বাবাকে গিয়ে বল্ না।

মজুমদার সাহেবের প্রসঙ্গে একটু চুপসে যায় সঞ্জয়। বললে, বাবাকে যে এসব কথা বলা যাবে না তা তুইও জানিস। তাই তো তোকেই বলছি। শত হলেও এই ব্যাপারে তুই ই তো বাবার প্রধান চাম্চা।

কি বললি দাদা, চোখ পাকায় রশ্মি, আমি বাবার চামচা? বেশ, আমি এক্ষুনি গিয়ে বাবকে কথাটা বলে দিচ্ছি।

কৃত্রিম মুখ ভার করে সঞ্জয় তার আদরের ছোট বোনটির দিকে তাকিয়ে বললে, বেশ তো, বল্ না গিয়ে। বাবাকে দিয়ে আমাকে দুটো কড়া কথা শোনালে যদি তোর আনন্দ হয় তা হলে তাই কর্গে, যা।

সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার হেসে ফেলে রশ্মি। দু হাতে সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট মেয়ের মত আবদারের স্বরে বলে উঠে, না রে দাদা, না। তোকে বকা খাইয়ে কি আমি আনন্দ পাই? আসলে ব্যাপার কি জানিস, এতগুলো মেয়ের মধ্য থেকে একটিকে বেছে তুলতে হলে ঐ রকম চার্ট করা ছাড়া আর উপায় কি বল্? এটা তো সবে প্রিলিমিনারি পর্ব। বাবার স্বভাব তো জানিস্। এরপরে ফাইন্যাল পর্ব অর্থাৎ জন্ম ছক্ বিচার। তারও পরে পাত্রী দেখা ইত্যাদি। বাবা একা মানুষ, পেরে ওঠেন না। আমিও তো নিজের সংসার ফেলে রোজ রোজ তোদের এখানে আসতে পারি না। তাই যখন আসি তখন এসে বাবাকে একটু সাহায্য করে যাই।

তা হলে বাবার চামচা নয়, তুই হলি তাঁর এ্যাড্ভাইসার।

—তা বলতে পারিস। হেসে জবাব দেয় রশ্মি।

মুখটিপে আবার হেসে বলে ওঠে সঞ্জয়, আমি বুঝতে পারছি না এতগুলো মেয়েকে নিয়ে এমন হিম্সিম্ খাবার কি দরকার তোদের? সোজা রাস্তা তো রয়েছে। কম্পিউটারে তো মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সবকিছু করে ফেলতে পারিস্।

কাম্পিউটরে পাত্রী বাছাই? হেসে ওঠে রশ্মি।

হাসি চেপে জবাব দেয় সঞ্জয়, বারে, এতে হাসির কি আছে? জানিস না, আজকাল কোন কোন আধুনিক জ্যোতিষী নাকি কম্পিউটরে কোষ্ঠি-ঠিকুজি

পর্যন্ত বিচার করে থাকে।

বেশ কয়েকটা দিন একটানা পরিশ্রমের পরে মজুমদার সাহেব শেষ পর্যন্ত লাস্ট লট অর্থাৎ প্রথম দশটি মেয়েকে বাছাই করতে সমর্থ হলেন। এ ব্যাপারে রশ্মিকে এ বাড়িতে এসে বেশ কয়েকবার তার বাবার সঙ্গে বৈঠকে বসতে হয়েছিল। পিতা-পুত্রীর মধ্যে আলোচনা, আরগুমেন্ট, কাউণ্টার আরগুমেন্ট ইত্যাদি অনেক কিছুর পরে সেই প্রথম দশটি বাছাই হলো।

হাতের ছোট্ট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রশ্মি তার বাবাকে বললে, না বাবা, আমাকে এখনই উঠতে হবে। চেম্বার থেকে তোমার জামাইয়ের ফেরার সময় হলো। গাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে।

—কিন্তু এই দশটি পাত্রীর মধ্যে প্রথম –দ্বিতীয় ইত্যাদি বাছাই তো এখনও বাকি রইলো, মা। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে মজুমদার সাহেব তাকান কন্যার দিকে।

জবাব দেয় রশ্মি, এখনই ওসব করে কি হবে, বাবা? আগে তোমার জ্যোতিষীর মতামত আনাও। তারপর বিবেচনা করা যাবে কে ফার্স্ট, কে সেকেণ্ড। তোমার তো আবার খুব ভালো রাজযোটক হওয়া চাই।

অলবৎ। বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, হাণ্ডেড পার্সেণ্ট রাজযোটক হতে হবে। নাইণ্টি নাইন পার্সেণ্ট হলেও চলবে না। মনে নেই, তোর বিয়ের ব্যাপারে হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট রাজযোটক বাছতে গিয়েই তো তোর শ্বশুরকে নগদ তিরিশটি হাজার টাকা দিতে হয়েছিল? তবে হ্যাঁ, জামাইটি আমার বাস্তবিকই চমৎকার এই বয়সে ডাক্তারীতে এমন সুনাম –।

নিজের বিয়ের প্রসঙ্গে একটু লজ্জা পায় রশ্মি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি এবার চলি, বাবা।

–আবার কবে আসবি, মা? জিজ্ঞেস করেন মজুমদার সাহেব।

জবাব দেয় রশ্মি, এখন তো আর তাড়াতাড়ির কিছু নেই, বাবা। তোমার সেই জ্যোতিষীর জবাব পেতে তো অনেক দেরি।

—তা অবশ্যি ঠিক, বললেন, মজুমদার সাহেব, মানুষটি যোটক বিচার করেন চমৎকার। তবে ঐ একটিই দোষ। বড্ড দেরি করেন। তাগিদ দিয়ে দিয়ে কাজ করাতে হয়।

প্রথম বাছাই দশটির মধ্যে মাত্র চারটি পাত্রী কলকাতার। বাকি ছ'টিই মফঃস্বল ও ভারতের অন্য রাজ্যের প্রবাসী বাঙ্গালী। একজন করে রয়েছে দিল্লী ও বম্বের। মজুমদার সাহেবের অনুপস্থিতিতে কৌতূহল বশে পাত্রীর

সেই চার্টখানা খুলে দেখছিল সঞ্জয়। দেড়শোর মধ্যে মাত্র দশ। এই দশটি পাত্রীর নামের পাশেই লাল কালির চিহ্ন। প্রথম লটে এই দশ জনের জন্ম ছক যাবে জ্যোতির্ষীর কাছে। পাত্রীদের নাম ঠিকানা ও অন্যান্য বায়ো-ডাটার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে সঞ্জয় মনে মনে নিজেকে একটা মোটা অঙ্কের লটারির টাকার সঙ্গে তুলনা করছিল। সে নিজে যেন সেই মোটা অঙ্কের লটারির টাকা। আর ঐ দেড়শো পাত্রী যেন টিকিটের ক্রেতা। দেড়শোর মধ্যে এই দশজনকেই ভাগ্যবতী বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে একজনের কপালেই থাকতে পারে ঐ মোটা টাকাটা। অবশ্যি সবই নির্ভর করবে সেই জ্যোতিষীর ওপর। রাজযোটকের সেই অধিকারীণীই হবে মহাভাগ্যবতী। আবার চাক্ষুস পাত্রী দেখার পরে ঐ মহাভাগ্যবতীই আবার ভাগ্যহীনা হয়ে উঠতে পারে। তখন আর একটি মহাভাগ্যবতীর খোঁজ করতে থাকবেন তার বাবা। কত বাধা, কত বিপত্তি এই মোটা টাকাটা পেতে। লটারির টাকা না হয়ে সঞ্জয় নিজে সল্টলেক অঞ্চলের একখানা লোভনীয় সরকারী ফ্ল্যাটও হতে পারে। সেখানেও লটারি। নানা হার্ডল্ ডিঙ্গিয়ে একটি একটি করে পিঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত ব্যাপার। অবশেষে ভেতরের কোডকের সন্ধান। সরকারী ফ্ল্যাটের ব্যাপারে হয়তো মিনিস্টারের তদ্বিরে কাজ হতে পারে, কিন্তু এই পাত্রী বাছাইয়ের ব্যাপারে মজুমদার সাহেবের কাছে কোন তদ্বিরই চলবে না।

বাইরের পাত্রীদের ছেড়ে কলকাতার পাত্রী চারজনের বায়ো-ডাটাগুলোই বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল সঞ্জয়। স্মৃতিশক্তি বরাবরই তার প্রখর। বার কয়েক চোখ বুলিয়েই সেগুলো তার প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে নিজেকে বেশ একজন ভারি কেউকেটা বলে মনে হচ্ছিল তার। সে নিজে যেন খোদ শিবঠাকুর। দশটি পার্বতী যেন তাকে পাবার জন্যে তপস্যায় বসেছে। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কিম্বা এদের মধ্যে আদৌ কারুর ভাগ্যে ছিঁড়বে কিনা তা জানতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যেই সঞ্জয় একদিন তার ছোটমামা ও মামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল কেদার-বদ্রীর উদ্দেশে।

চার

পাউড়ী থেকে গৌরীকুণ্ড ঘণ্টা আটেকের পথ। সকাল ন'টায় ট্যুরিস্ট বাস ছাড়লো পাউড়ী থেকে। বাসের সিট নিয়ে আবার সেই পুরানো সমস্যা। জয়ন্তী এবার আর কিছুতেই বসবে না সঞ্জয়ের পাশের সিটে। অবশেষে বনানীর পাশে জয়ন্তীকে বসিয়ে পরিতোষকেই চলে আসতে হলো ভাগ্নে সঞ্জয়ের

পাশে। উজ্জ্বলা ও বনানীর মাঝখানে জয়ন্তী।

কেদারনাথের পথে গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে বাস চলছে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাষায় বাসের যাত্রীরা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কেউ কেউ আবার কথা না বলে কেবল জানালা দিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছে হিমালয়ের সৌন্দর্য। দূরে বসেও বীনা মাঝে মাঝেই জয়ন্তীর দিকে টিপ্পুনি ছুঁড়ে দিচ্ছে। অন্য সময় হলে জয়ন্তীও এর জবাব না দিয়ে ছাড়তো না। কিন্তু আজ সে একেবারেই বোবা। লজ্জারক্তিম মুখে সুন্দর ভ্রূ-যুগল কুঁচকে মাঝে মাঝে নীরব ধমকে সে থামাতে চেষ্টা করেছে ঐ বিচ্ছু মেয়েটাকে। সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বীনার টিপ্পুনি উপভোগই করেছিল। এদিকে, কাছে পেয়ে বনানীও এবার মৃদু কণ্ঠে কথা বলে চলছিল জয়ন্তীর সঙ্গে। এই সুযোগে পাত্রী যাচাইয়ের কাজটাও সে সেরে ফেলতে চায়।

মামা পরিতোষের সঙ্গে দু চারটা কথার পরে সঞ্জয় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার কান দুটো কিন্তু খাড়া হয়ে ছিল তার মামী ও জয়ন্তীর কথার দিকে। আসলে সেই মুহূর্তে হিমালয়ের অস্তিত্বের চাইতে ঐ জয়ন্তীর অস্তিত্বই যেন বেশি করে অনুভব করছিল সঞ্জয়। এমন একটা পরিবেশে পাত্র পাত্রীর এমনি এক আশ্চর্য যোগাযোগ গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও তার নিজের জীবনে যে এটা ঘটেছে তাতেই সে বিস্ময়বোধ করছিল।

অবশেষে বিকেলে বাস এসে থামলো গৌরীকুণ্ড। পথে পড়লো রুদ্রপ্রয়াগ ও গুপ্তকাশী। এই রুদ্রপ্রয়াগেই শান্ত মন্দাকিনীর সঙ্গে মিশেছে অশান্ত অলকানন্দা। রুদ্রদেবের একটা ছোট মন্দির রয়েছে এখানে। কথিত আছে এই মন্দিরের কাছেই নাকি দেবর্ষি নারদ সঙ্গীত শিক্ষার আশায় শিবের ধ্যান করেছিলেন।

চলন্ত বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গাইড নটিয়াল নারদঠাকুরের সেই ধ্যানের কথা বলতেই মামা নটিয়ালকে জিজ্ঞেস করেছিল, ধ্যানের রেজাল্ট কি হয়েছিল, ভাইসাব? নারদ শিবের দেখা পেয়েছিলেন কি?

— জরুর। হেসে জবাব দিয়েছিল রসিক নটিয়াল, শিবের কাছে তালিম নিয়েই তো নারদের বীণায় এমন দখল হয়েছিল।

নটিয়াল তার বক্তৃতার শেষে নিজের সিটে বসতেই বীনা মুখটিপে হেসে মামাকে বললে, শুনলি তো। জাগ্রত শিব এখানে। চান্স পেলে এখানে শিবের মাথায় একটু জল ঢেলে আসতাম। আমাদের কপাল তো আর জয়ন্তীর মত নয় যে জলটল না ঢেলেই একেবারে হাতে হাতে ফল।

কথাটা কানে যেতেই দলের সবাই হেসে ওঠে। কেবল হাসতে পারে না

জয়ন্তী। আর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলেও তা' গোপন করে সঞ্জয় তাকিয়ে থাকে বাইরে।

রাতে গৌরীকুণ্ডের ট্যুরিস্ট লজে বসে জোর আলোচনা। আলোচনার বিষয়বস্তু—ঘোড়া। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথের পনেরো কিলোমিটার চড়াই পথ কিভাবে যাওয়া যাবে সেই আলোচনার সূত্রপাত করে পরিতোষ বললে, এবার বলো, তোমরা কে কে ঘোড়ায় যেতে চাও?

একে বাঙ্গালী ললনা, তায় আবার পাহাড়ী পথে ঘোড়া। পরিতোষের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে ওঠে মেয়েরা। সবার মুখেই একই কথা—না বাপু, ঐসব ঘোড়া ফোড়ায় চড়তে পারবো না। শত হলেও জানোয়ার বৈ তো নয়। তার চাইতে হেঁটেই যাবো।

—কিন্তু পাহাড়ী পথে হাঁটার অর্থ বুঝতে পারছো? বীনার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে পরিতোষ, পনেরো কিলোমিটারের গোটা পথটাই চড়াই। উৎরাই নেই একটুও। তারওপর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের রাস্তা যা নাকি এই কয়েকদিনের বৃষ্টিতে দারুণ পিচ্ছিল। একবার পা হড়কে গেলেই পপাত ধরণীতলে। আর শতশত ফুট নিচের খাদে পড়ে গেলে তো কথাই নেই। একেবারে সশরীরে স্বর্গলাভ। কাজেই ভালো করে সবাই ভেবে দেখ। আবার মাঝরাস্তায় গিয়ে যদি আর চলতে না পারো তা হলে দলছাড়া হয়ে পড়তে হবে। মাঝপথে মাথা কুটলেও ঘোড়া পাবে না। এসব খবর আমি জোগাড় করেছি মিস্টার তামিলনাড়ুর কাছ থেকে। ভদ্রলোক এই নিয়ে পঞ্চমবার এসেছেন কেদারে।

মিস্টার তামিলনাড়ু? সে আবার কে? ছোটমামার মুখের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকায় সঞ্জয়।

হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, আমাদের পাশের সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোক। বেঙ্কট না কি যেন কটমট একটা নাম বলেছিল। আমি তাই সহজ করে ঐ তামিলনাড়ু নাম রেখেছি। আশ্চর্য সহ্যশক্তি ঐ ভদ্রলোকের। এই গৌরীকুণ্ডতেই যেখানে আমরা শীতে প্রায় জমে যাচ্ছি সেখানে একটু আগে এই ট্যুরিস্টলজের খোলা বারান্দায় ভদ্রলোককে দেখে এলাম পায়চারি করে হাওয়া খেতে। গায়ে-পায়ে চাপিয়েছে হাওয়াই।

—হাওয়াই?

—হ্যাঁ, হাওয়াই। গায়ে চাপিয়েছে একটা পাতলা হাওয়াই সার্ট, আর পায়ে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল। আমরা হলে তো এতক্ষণে ঐ হাওয়াইয়ের সঙ্গেই একেবারে হাওয়া হয়ে যেতাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গায়ের গরম ওভার কোটের ওপর চাপানো মোটা র‍্যাপারটা আর একটু টেনে দেয়

পবিতোষ।

উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে বীনা বললে, তোমার না হাঁটুতে চোট আছে, উজ্জ্বলাদি? তুমি এই পাহাড়ী চড়াই হাঁটবে কেমন করে? আর কেউ না নিলেও তোমাকে তো ঘোড়া নিতেই হবে।

বীনার কথায় উজ্জ্বলার মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলে-বেলায় স্কুলে খেলতে গিয়ে একবার পড়ে গিয়ে হাঁটুর মালাই চাকিতে গোলমাল হয়েছিল। সেই থেকে একটু বেশি হাঁটলেই পায়ের শিরায় টান ধরে।

বীনার কথায় মৃদু কণ্ঠে উজ্জ্বলা বললে, বলেছিস তো ঠিকই। কিন্তু কেবল আমি এক ঘোড়ায় যাবো? কথার শেষে অসহায় দৃষ্টিতে সে সকলের দিকে তাকায়।

উজ্জ্বলার মনের কথা টের পেয়ে বলে ওঠে পবিতোষ, না—না দিদি, তুমি একা যাবে কেন?

পরে স্ত্রী বনানীর দিকে তাকিয়ে আবার বললে, এর চেহারাটা বাইরেই যা মোটাসোটা। ভেতরটা একেবারেই ফাঁপা। এই বয়সেই হাইপ্রেশার। কেদারনাথের সাড়ে বারো হাজার ফিট উপরে হেঁটে উঠলে আমাকে এখানেই বিধবা হতে হবে।

পবিতোষের কথায় সবাই হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বনানী বললে, তাই বলে আমরা দুজন মেয়েছেলে কেবল ঘোড়ায় যাবো? সঙ্গে তোমরা কেউ যাবে না?

—আরে বাপু, এখানে মেয়েছেলে–ব্যাটাছেলে বলে কিছু নেই। সবাই তীর্থযাত্রী। দেখবে তোমাদের সঙ্গে কত লোক ঘোড়ায় চেপে চলেছে। কাজেই

না, তা হবে না। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বনানী, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে।

— বেশ তো, বলে ওঠে সঞ্জয়, আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে, ছোটমামী।

সঞ্জয়ের কথায় একটু সময় কি যেন চিন্তা করে পবিতোষ। তাকিয়ে দেখে বীনা ও সঞ্জয় পরস্পরের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসছে, আর উজ্জ্বলা নিজের গায়ের কামিজের একটা কোণের ভাজ সোজা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

পবিতোষ সঞ্জয়কে বললে, সখ করে দামী ক্যামেরাটা সঙ্গে এনেছিস। ঘোড়ায় চাপলে তো আর পথের ছবি তুলতে পারবি না। আমি আবার ওসব ক্যামেরা ক্যামেরা হ্যাণ্ডল করতে পারি না। তার চাইতে তুই ওদের সঙ্গে হেঁটে

যা। আমি এদের সঙ্গে ঘোড়ায় যাবো।

শাড়িপরা মেয়েদের ঘোড়ায় চড়া যে কি দুরূহ সমস্যা তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। ভয়, লজ্জা, অস্বস্তি কাটিয়ে প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গাধার সাইজের পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে চাপতেও একখানা উঁচু পাথর খণ্ডের দরকার। দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসলে পরনের শাড়ির অবস্থা হয় মালকোঁচা দিয়ে পরা হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতির মত। শীতের দেশে শাড়ির আড়ালে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গেঞ্জির ড্রয়ার থাকে বলেই যা রক্ষে।

মহাতীর্থের বন্ধুর পথ। শত শত তীর্থযাত্রীর আনাগোনা সেইপথে। দেবতাত্মা হিমালয়ের বিরাট বিশাল বুকের ওপর এক টুকরো সরু সুতোর মত সেই পথ বেয়ে পিল্ পিল্ করে চলেছে তীর্থযাত্রীরা। সর্বাঙ্গ গরম জামা-কাপড়-জুতোয় মুড়ে মাঙ্কিক্যাপের আড়ালে কেবল চোখদুটো খোলা রেখে হাতে লাঠি-নিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কিসের আকর্ষণে তারা চলেছে ঐ পথে? সঙ্গতি-সম্পন্নদের বেলায় এটা হয়তো তীর্থভ্রমণের বাইরেও অন্যকিছু। হয়তো এ্যাডভেঞ্চার কিম্বা স্পোর্টস। হয়তো বা স্রেফ কৌতূহল। কিন্তু সঙ্গতিহীনদের বেলায়? শীতের কামড় থেকে বাচার কোন উপকরণ নেই। গায়ে একটুক্রো কাপড় কিম্বা ছেঁড়া কম্বল, পায়ে সামান্য একজোড়া স্যাণ্ডল পর্যন্ত নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পা দু'খানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সেই ভাবেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে তীর্থ-দর্শনে। এমনকি বিকলাঙ্গ পঙ্গু পর্যন্ত গিরি লঙ্ঘন করে চলেছে। এ কিসের টান -কিসের আকর্ষণ? কোত্থেকে আসে এই মানসিক শক্তি? কে জোগায় মানুষের মনের এই দৃঢ়তা যা নাকি যুগ যুগ ধরে সংক্রামিত হয় একমন থেকে অন্যমনে?

চতুষ্পদ ঘোড়া স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের চাইতে আগে চলে। তাই মাত্র শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই বনানী ও উজ্জ্বলাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় পরিতোষ। উজ্জ্বল ও বনানীর ঘোড়ার তরুণ সহিস দু'টির কথাবার্তাও চমৎকার। ঘোড়ার পিঠে মহিলা দুজনের জড়োসড়ো অবস্থা দেখে শীতে পোড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে আশ্বাস দেয়, ডরিয়ে মৎ মাঈজী। আরাম সে বৈঠিয়ে। এ মামুলি ঘোড়ে নেহি হ্যায়। এ হ্যায় কেদারনাথ জী কা আস্‌লি নোকর। যাত্রীওকে কেদারনাথজী কো পাশ লে জানে কে লিয়েই ইস্‌কা জনম হুয়া, মাঈজী।

সরু পাহাড়ী পথ। পাশাপাশি দু জন চলার উপায় নেই। তার ওপর উল্টোদিকের যাত্রীও রয়েছে। তারই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ যাত্রীবাহী ঘোড়া

চলে যায় পাশ কাটিয়ে। সহিসের মুখে সাবধান বাণী। সরু রাস্তার এমন কিনার ধরে খটাখট্ শব্দ তুলে ঘোড়া চলে যায় যে দেখে ভয় হয় এই বুঝি পা পিছলে পড়ে গেল খাদের মধ্যে। কিন্তু পড়ে না সচরাচর।

লাঠি হাতে আগে আগে চলেছে বীনা। তারপরে মায়া। দু জনের গায়েই জিন্‌স-সার্টের ওপর চাপানো ওভারকোট। সবশেষে জয়ন্তী। তার গায়ে সালোয়ার কামিজের ওপর ভারি পুলওভার। মায়ার গলায় একটা ছোট্ট ক্যামেরা, কাধে জলের জায়গা। বীনার কাধে সাইড্ ব্যাগ। জয়ন্তীর হাতে লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই। একেবারে পেছনে ট্র্যাকিং স্যুট পরা সঞ্জয়। চোখে তার কালো চশমা। গলায় ঝোলানো দামী ক্যামেরা। কাধের একপাশে সাইড ব্যাগ, অন্যপাশে ওয়াটার বট্‌ল।

এগিয়ে চলছে দলটি। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। পাহাড়ের অলটিচুড্ যতই বাড়ছে ততই ক্লান্তিবোধ করছে তারা। রঙ্গরস তো দূরের কথা, যাত্রা শুরুর প্রথম দিকের সামান্য কথা বার্তাটুকুও বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে তখন কেবল একটামাত্র চিন্তা তাদের মনের মধ্যে — আর কতদূর?

ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত যাই হোক্ না কেন তিন কন্যার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগলো। বীনার কেবল মুখেই খই ফোটে না, পায়েও তার পাখনা লাগানো। তরতর করে এগিয়ে যায় সে। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে লাঠির ওপর ভর দিয়ে বিশ্রাম করতে করতে পেছনে পড়ে থাকাদের জন্যে অপেক্ষা করে। তারা একটু কাছে এলেই আবার চলতে শুরু করে। হাঁটার ক্ষমতায় বিহারী মেয়ে মায়াও খুব একটা কম যায় না। অতি অল্প সময়েই সে প্রায় ধরে ফেলে বীনাকে। কিন্তু মুশকিলে পড়ে জয়ন্তী। সে স্টেডি হলেও স্লো। রেসে উইন করে সে অবশ্যই কেদারনাথ পৌঁছবে, কিন্তু ততক্ষণে বান্ধবীদের সঙ্গে তার এক বিরাট ব্যবধান রচিত হবে।

জয়ন্তীর চাইতেও মুশকিল সঞ্জয়ের। এত আস্তে হাঁটতে সে অভ্যস্ত নয়। ইচ্ছে করলে সে এদের সবাইকে ডিঙিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই সে বাধ্য হয়েই হাঁটতে থাকে জয়ন্তীর পিছু পিছু। একসময় বীনা ও মায়া তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই সঞ্জয় চলতে চলতে বললে, ওরা সবাই যে চলে গেল। একটু তাড়াতাড়ি চলতে চেষ্টা করুন।

ঘাড় ফিরিয়ে জয়ন্তী একবার তাকায় সঞ্জয়ের দিকে। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, এর চাইতে তাড়াতাড়ি চলার ক্ষমতা তো আমার নেই। তবে আপনার যদি তাড়া থাকে তো—

জয়ন্তীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে সঞ্জয়, না—না, আমার

আবার তাড়া কিসের ? তা ছাড়া, আপনাকে একা ফেলে রেখে তো আর যেতে পারি না।

—না—না, তাতে কি ? বলতে থাকে জয়ন্তী, পথ হারাবার যখন ভয় নেই তখন আমার জন্যে আপনাকে পিছিয়ে পড়তে হবে না। রাস্তায় এত যাত্রী রয়েছে। আমি দিব্বি একাই যেতে পারবো।

—থাক্, আপনি চলুন। সঞ্জয় বললে, আমি আপনার পেছনেই আছি। আপান ধীরে ধীরেই চলুন।

মিনিট পনেরো একটানা চড়াই পার হয়ে খানিকটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্তী। সঞ্জয় এগিয়ে এসে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি ?

জয়ন্তী জবাব না দিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে কেবল হাঁপাতে থাকে। ঠিক্ এমনি সময় সন্ন্যাসী গোছের একটি মানুষ পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে জয়ন্তীকে দেখে সঞ্জয়কে হিন্দীতে বললে, এত তাড়ার কি আছে, বাবুজী ? মাইজীকে একটু বিশ্রাম করিয়ে নিন্ না। আর সামান্য কিছুদূর গেলেই তো রামওয়াড়া ! তারপরেই গৌড়চট্টি হয়ে একেবারে কেদারনাথ। কথার শেষে 'জয় কেদার বলেই মানুষটি এগিয়ে যায়।

পথে-প্রান্তরে যে কোন তীর্থযাত্রীর একটা প্রধান সম্পদ অন্যের দেয়া উৎসাহ। পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা তাদের উৎসাহে 'থোড়ি দূর' হয়ে গিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত যাত্রীকে উৎসাহ জোগায়। ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে নতুন উদ্যমে তীর্থক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে এটা কাজ করে টনিকের মত।

মেঘে ঢাকা আকাশ। হিমালয়ের হিমশীতল হাওয়া গরম পোশাক ভেদ করে শরীরে হুল ফোটায়। মাথার উলের টুপিটা কপালের দিকে একটু ঠেলে তুলতে তুলতে সঞ্জয় জয়ন্তীকে বললে, শুনলেন তো, রামওয়াড়া এখান থেকে আর বেশি দূরে নয়। ওখানে আপনার বান্ধবীরা অবশ্যই অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। তার আগে আসুন আমরা একটু বিশ্রাম করে নিই।

—এখানে বিশ্রামের জায়গা কোথায় ? জিজ্ঞেস করে জয়ন্তী।

জবাব দেয় সঞ্জয়, ঐ তো, ঐ মোটা গাছটার নিচে কয়েকটা পাথর পড়ে আছে। ওখানে বসেই একটু বিশ্রাম করা যাবে।

পাশাপাশি দু'টো পাথরে বসে সঞ্জয় তার ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে জয়ন্তীর হাতে দিয়ে বললে, নিন্, গ্লুকোজ মেশানো জল। 'এটুকু খেয়ে

ফেলুন। শরীরে বল পাবেন।

বাস্তবিকই প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছিল জয়ন্তীর, কিন্তু লজ্জায় এতক্ষণ বলতে পারছিল না। পাহাড়ী পথে পরিষ্কার জলের দাম অনেক। পাহাড়ী ঝরণার জলে সমতলের মানুষের পেটের গোলমাল হবার সম্ভাবনা। জয়ন্তীদের জলের জায়গাটা রয়েছে মায়ার কাছে, আর খাবারের ব্যাগ বীনার হেপাজতে।

সঞ্জয় নিজেও একঢোক জল খেয়ে নেয়। তারপর ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো কিস্‌মিস্, আখরোট, বাদাম বের করে জয়ন্তীকে বললে, নিন্ ধরুন, এগুলো দিয়েই আপাতত খিদে মিটিয়ে নিন্।

—না—না, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে জয়ন্তী, আমার একদম খিদে পায়নি।

জয়ন্তীর কথায় হেসে উঠে সঞ্জয় বললে, জানেন তো তীর্থস্থানে এসে মিথ্যে বলতে নেই? সেই কোন্ সকালে আমরা সবাই চা-টোস্ট খেয়ে বেরিয়েছি। তার ওপর এত পরিশ্রম। খিদে আপনার অবশ্যই পেয়েছে।

সলজ্জ ভঙ্গিতে বলতে থাকে জয়ন্তী, না-না, সত্যি, আমার খিদে পায়নি।

—আলবৎ পেয়েছে। লজ্জায় আপনি এই কথা বলছেন।

একটু থেমে সঞ্জয় আবার বলতে থাকে, জানেন, পথে-প্রবাসে লজ্জা করতে নেই। ভালোবেসে কেউ কিছু দিলে তা' গ্রহণ করা উচিত।

কথাটা বলে ফেলে সঞ্জয় নিজেই একটু লজ্জাবোধ করতে থাকে। ছি-ছি, কথাটা এভাবে বলা তার ঠিক হয়নি। ঐ ভালোবাসা শব্দটা না বলাই উচিত ছিল। অবশ্যি এ ভালোবাসা সে ভালোবাসা নয় যা নাকি একজন অনাত্মীয় নারীর সামনে একজন পুরুষের উচ্চারণ করা শালীনতা বিরুদ্ধ। ভালবেসে কারুর কিছু দেয়ার অর্থ খুশি হয়ে দেয়া।

সঞ্জয়ের কথায় জয়ন্তীর মুখে কেমন যেন একটা লজ্জার ভাব ছড়িয়ে পড়ে। সঞ্জয় ঠিক বুঝতে পারে না জয়ন্তীর এই লজ্জা ঐ ভালোবাসা শব্দটির জন্যে নাকি তার দেয়া জিনিস গ্রহণ করার জন্যে।

একটু সময় দ্বিধা করে অবশেষে জয়ন্তী হাত পেতে জিনিসগুলো নিজের মুঠোয় নিয়ে চুপ্ করে বসেই থাকে। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে আর একমুঠো কিস্‌মিস্ ইত্যাদি বের করে খেতে খেতে সঞ্জয় বলতে থাকে, কিস্‌মিস্, আখরোট, বাদামে এনার্জি বাড়ায়। পাহাড়ী পথে চলতে এগুলোর বিশেষ প্রয়োজন।

কথা বলতে বলতে সঞ্জয় লক্ষ্য করে জয়ন্তী জিনিসগুলো মুঠোয় ধরেই আছে। খাচ্ছে না। তাই সে আবার বলে ওঠে, ওকি, খাচ্ছেন না কেন?

—না-না, খাচ্ছি। কথাটা বলেই জয়ন্তী কয়েকটা বাদাম মুখে পুরে বললে, আমরা তো এখানে বিশ্রাম করছি। ওরা হয়তো এতক্ষণে ঐ রামওয়াড়ায় পৌঁছে গেছে

—তা হয়তো গেছে, জবাব দেয় সঞ্জয়, ওখানে নাকি কিছু দোকানপাট আছে। খাবার-দাবার পাওয়া যায়। ওঁরা হয়তো এতক্ষণে গরম চা সামনে নিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে।

গরম চায়ের কথায় খুশি হয়ে ওঠে জয়ন্তী। পরক্ষণেই নিজের হাত ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে ম্লান স্বরে বললে, আচ্ছা, ওরা যদি আমাদের দেরি দেখে অপেক্ষা না করে রামওয়াড়া থেকে এগিয়ে যায়?

—যায় তো যাবে, জবাব দেয় সঞ্জয়, আমরাও রামওয়াড়ায় পৌঁছে গরম পাকুড়ি আর দু'কাপ করে কড়া চা খেয়ে আবার রওনা হবো।

—সেকি? একটু যেন চমকে ওঠে জয়ন্তী, গোটা রাস্তায় ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না আমাদের?

কিস্‌মিস্‌, আখরোট চিবোতে চিবোতে নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দেয় সঞ্জয়, দেখা দিতে না চাইলে দেখা হবে কি করে, বলুন? ওঁরা যখন জানেন যে আপনি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না তখন ওঁদের তাড়াতাড়ি চলে যাবার একমাত্র অর্থ আপনাকে এড়ানো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে জয়ন্তী, এ আপনি কি বলছেন? ওরা আমাকে এড়াতে চাইবে কেন?

—অবশ্যই আপনাকে এড়াতে চাইছে। আর, সেই সঙ্গে আমাকেও। কথাটা বলেই মিটিমিটি হাসতে থাকে সঞ্জয়।

লজ্জায় কান দু'টো লাল হয়ে ওঠে জয়ন্তীর। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আর না, এবার চলুন।

—বেশ চলুন। উঠে দাঁড়ায় সঞ্জয়ও।

পথ আর পথ। এ পথের যেন শেষ নেই। যতদূর চোখ যায় ঢেউ খেলানো পাহাড় আর পাহাড়। আকাশের মেঘ চিরে মাঝে মাঝে সূর্যদেব দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ের চূড়োয় ফুটে উঠছে রোদের ঝিলিক্‌। পরক্ষণেই আবার মেঘলা আকাশের নিচে পাহাড়ের গাম্ভীর্য।

এদিকের রাস্তা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। পাশাপাশি কথা বলতে বলতে হেঁটে চলেছে সঞ্জয় ও জয়ন্তী। সঞ্জয় একসময় বললে, এটাকে যে কি বলে আখ্যা দেয়া যাবে বুঝতে পারছি না।

—কোন্‌টাকে? চলতে চলতে সঞ্জয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় জয়ন্তী।

জবাব দেয় সঞ্জয়, এই হিমালয়ের রাজ্যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটাকে।

—স্রেফ এ্যাক্সিডেন্ট, মৃদু হেসে জয়ন্তী বললে।

চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে জয়ন্তীর সুন্দর মুখখানির দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে সঞ্জয়, আপনি এটাকে এ্যাক্সিডেন্ট বলতে চান বলুন। আমার মতে কিন্তু এটা মিরাক্‌ল্‌—অলৌকিক।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে সঞ্জয়, কলকাতায় বসে আমার বাবা আপনার-আমার জন্ম-ছকের মধ্যে মিল-গরমিল খুঁজে ফিরছেন, আর এই হিমালয়ের রাজ্যে আট-দশ হাজার ফুট উঁচুতে কেদারনাথের পথে আমি-আপনি পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। একে মিরাক্‌ল্‌ বলবো না তো কি বলবো?

জয়ন্তী কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। এক সময় সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আপনার বাবার বুঝি কোষ্ঠি-ঠিকুজির ওপর খুব বিশ্বাস?

বিশ্বাস শুধু? জবাব দেয় সঞ্জয় অগাধ বিশ্বাস। বিয়ে-শাদির ব্যাপারে কোষ্ঠি ঠিকুজির মিল ছাড়া আমার বাবা এক পা এগোন না। জানেন, আমার ছোটবোনের বিয়ের ব্যাপারে কেবলমাত্র এই জন্যেই আমার বাবা অনেক ভালো পাত্র ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র কথা, পাত্র-পাত্রীর জন্মছকে একশো ভাগ রাজযোটক হওয়া চাই। নিরানব্বই ভাগ হলেও চলবে না।

মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে জয়ন্তী, এই রাজযোটক ব্যাপারটা কি, বলুন তো? সঞ্জয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় এতক্ষণে অনেক সহজ হয়ে ওঠে সে।

—কি জানি? জব্বর রকমের কোন গরমিল হয়তো।

—গরমিল? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর জয়ন্তীর, পাত্র-পাত্রীর বড় রকমের গরমিল মানেই রাজযোটক? নাকি বড় রকমের মিল?

মৃদু হাসে সঞ্জয়। তারপর জবাব দেয়, কিছু মনে করবেন না। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণটাই যদি রাজযোটকের আসল অর্থ হয় তা'হলে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি মনে করি তাদের চরিত্রের অমিল হতে হবে। একজন হবে শান্ত, অন্যজন দুরন্ত। একজন পছন্দ করবে টক, অন্যজন মিষ্টি। একজন কম কথা বলবে, অন্যজনের বক্‌বকানিতে কাছে থাকাই দায় হয়ে উঠবে ইত্যাদি। কথার শেষে হাল্‌কা সুরে সঞ্জয় হেসে উঠতেই জয়ন্তীও হাসে।

ঠিক্ এমনি সময় 'হঠ্‌ যাও—হঠ্‌ যাও' বলে পেছনে একটা শব্দ হতেই সঞ্জয় ও জয়ন্তী দুজনেই চম্‌কে উঠে রাস্তার একপাশে সরে যেতে চেষ্টা করতেই

একখানা আলগা পাথরে পা হড়কে যায় জয়ন্তীর। টাল সামলাতে না পেরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মুহূর্তেই সঞ্জয় দু'হাতে জাপ্টে ধরে তাকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে 'হঠ্ যাও—হঠ্ যাও' বলতে বলতে চারজন ডাণ্ডি-বাহকের একটি দল এক বিরাটবপু মাড়োয়ারী মহিলাকে ডাণ্ডিতে চাপিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

দলটি চলে যেতেই জয়ন্তীকে ছেড়ে দিয়ে সঞ্জয় বিরক্ত কণ্ঠে ডাণ্ডি-ওয়ালাদের উদ্দেশে বলে ওঠে, তাড়াতাড়ি যাবি তো যা। পেছন থেকে হঠাৎ এমনি চেঁচিয়ে উঠে সামনের লোকদের ভড়কে দেয়া কেন? আর একটু হলে কি বিপদ ঘটতো, বলুন তো! বলতে বলতে সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে জয়ন্তীর হাতের ছিটকে-পড়া লাঠিখানা কুড়িয়ে এনে জয়ন্তীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথাও চোট্ লাগে নি তো?

—সেই সুযোগ আর আপনি দিলেন কোথায়? কথাটা বলেই মিষ্টি হেসে কৃতজ্ঞ চোখে সঞ্জয়ের দিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তী আবার বললে, ঠিক্ আছে, এবার চলুন।

রামওয়াড়ার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। আর মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। পথের পাশে একটু প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় পাশাপাশি দু'টো ছোট গাছ। পেছনে খাড়াই পাহাড়। সেখানে আসতেই সঞ্জয় দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, এক মিনিট দাঁড়ান। জায়গাটা বড় সুন্দর। একটা ছবি তুলে নিই।

জয়ন্তী দাঁড়ায়। সঞ্জয় দু'পা এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে আধ-বসা অবস্থায় জায়গাটার ছবি তুলে ক্যামেরা বন্ধ করতে করতে এগিয়ে এসে বললে, চলুন।

জয়ন্তী এগোতে যাবে, হঠাৎ কি মনে করে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে সঞ্জয়। তারপর একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে, একটা অনুরোধ করবো, কিছু মনে করবেন না তো?

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় জয়ন্তী। সঞ্জয় বললে, আপনার একখানা ছবি তুলবো?

—আমার ছবি? সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বলে ওঠে জয়ন্তী, আমার আবার ছবি কেন?

জবাব দেয় সঞ্জয়, প্রকৃতিদেবীর জীবন্ত প্রতিনিধি তো আপনারাই। তাই প্রকৃতির কোলে আপনাদেরই ভালো মানায়। আপত্তি না থাকে তো দয়াকরে ঐ গাছ দু'টোর ঠিক মাঝখানে একটু দাঁড়ান। দারুণ ছবি হবে একখানা।

—কিন্তু—। একটু ইতস্তত করে জয়ন্তী।

—কিন্তু কি ? কোন বাধা আছে নাকি ছবি তোলাতে ?

—না—না, বাধা কিসের ?

একটু থেমে জয়ন্তী আবার বললে, আমি ভাবছি ঐ রীনা-মায়া যদি এসব জানতে পারে কিম্বা এই ছবি যদি কোনভাবে ওদের চোখে পড়ে—

—কোন সম্ভাবনা নেই, বলে ওঠে সঞ্জয়, আপাতত আপনি আমার এই ফিল্মের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবেন। এর প্রিণ্ট হবে কলকাতায় ফিরে গিয়ে। আর আমি-আপনি না বললে আপনার ঐ বান্ধবীরা জানবে কেমন করে ?

তা বটে। একটু চিন্তা করে জয়ন্তী। লুকিয়ে কোন কাজ করার মধ্যে যে একধরনেব আনন্দ আছে তেমনি এক আনন্দই যেন সেই মুহূর্তে সে অনুভব করে। আর দ্বিধা না করে সে গিয়ে দাঁড়ায় সেই গাছের কাছে। বিভিন্ন কোন থেকে তার তিন চারখানা ছবি তোলে সঞ্জয়।

যা ভেবেছিল ঠিক্ তাই। রামওয়াড়ায় অনেক খোঁজ করেও পাওয়া গেল না রীনা ওমায়াকে। বোঝা গেল সঞ্জয় জয়ন্তীর দেরি দেখে তারা কেদারনাথের পথে গরুড়চট্টির দিকে এগিয়ে গেছে।

ছবি তোলার বাধা যখন একবার সরে গেছে তখন আর সঞ্জয়কে পায় কে ? হিমালয়ের ছবির সঙ্গে নানা ভঙ্গিমায় জয়ন্তীরও একের পর এক ছবি তুলেছে সে। লাঠি হাতে জয়ন্তী হাঁটছে, পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম করছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে জয়ন্তী তাকিয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। এমনকি রোডেডেণ্ড্রন গাছ থেকে একগোছা টকটকে লাল ফুল তুলে জয়ন্তীর খোঁপায় গুঁজে তার ছবিও নিয়েছে সঞ্জয়।

রামওয়াড়া থেকে গরুড়চট্টি কঠিন খাড়াই পথ। সঞ্জয়ের সঙ্গে গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে পথের কষ্ট একেবারেই টের পায়নি জয়ন্তী। আসলে দেহের কষ্ট অনুভব করে মন। সেই মন যখন আনন্দে ভরে থাকে তখন দেহের কষ্ট আর টের পাওয়াই যায় না।

অবশেষে পথের শেষে কেদারনাথ। চারিদিকে তুষার আর তুষার। চোখের সামনে যা কিছু পড়ছে সবই সাদা তুষারে ঢাকা। এমনকি পথ-ঘাট পর্যন্ত তুষারময়। একখানা পাথর পর্যন্ত কোথাও চোখে পড়ে না। সেই তুষার সাম্রাজ্যে তুষার শৃঙ্গের পাদদেশে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে কেদারনাথের সুদৃশ্য মন্দির। দূর থেকে সেই মন্দির চোখে পড়তেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে জয়ন্তী। পিচ্ছিল তুষারময় পথে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কায় লজ্জা-সঙ্কোচ ভুলে সে শক্ত হাতে সঞ্জয়ের একটা হাত চেপে ধরে মন্দিরের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যায় তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ট্যুরিস্টলজের দিকে।

মন্দিরে যাবার প্রধান রাস্তা থেকে সরকারী ট্যুরিস্টলজ মাত্র শ'দুয়েক গজ দূরে। যাবার পথ বলে কিছু আর নেই। চারিদিকেই বরফ। মিলিটারি ট্রেঞ্চের মত বরফ কেটে সরু রাস্তা করে দেয়া হয়েছে যাত্রীদের জন্যে। প্রায় কাঁধ সমান উঁচু সেই বরফের টেঞ্চের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করেছে যাত্রীরা।

ট্রেঞ্চের সামনে এসেই যেন সম্বিৎ ফিরে পায় জয়ন্তী। সহসা সঞ্জয়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বললে, জানেন, লজের ভেতরে ঢুকতে আমার রীতিমত ভয় করছে।

—ভয়? কিসের ভয়? জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়।

প্রচণ্ড শীতে নীল হয়ে ওঠা পাতলা ঠোঁট জোড়া জিভ দিয়ে একবার ভিজিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে সঞ্জয়ের পিছু পিছু চলতে চলতে জবাব দেয় জয়ন্তী, এই যে গোটা পথ একা আপনার সঙ্গে এলাম তা' নিয়ে ওরা পেছনে লাগতে কি ছাড়বে মনে করেছেন?

—বারে, পেছনে লাগবে কেন? ওরা তো ইচ্ছে করেই আমাকে-আপনাকে পেছনে ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে।

—আপনি তো ওদের চেনেন না। বিশেষ করে ঐ রীনাটা একটা সাক্ষাৎ বিচ্ছু মেয়ে। আমার পেছনে লাগবার জন্যেই ও ইচ্ছে করে এমন করেছে। দারুণ ভালোবাসে আমাকে।

—কিন্তু বাসে তো সারাটা পথ আপনার ঐ বিহারী বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়েই গল্প করতে করতে এসেছে।

হেসে জবাব দেয় জয়ন্তী, গায়ের কাছে থাকলে পেছনে লাগতে সুবিধে হবে না বলে ইচ্ছে করেই আমাকে দূরে রেখেছে। ওর স্বভাবটাই এমনি। কলেজেও তাই। সর্বদা আমার সঙ্গে খুনসুঁটি করবে, আবার আমার যে কোন অসুবিধায় নিজেই এগিয়ে এসে আমাকে আগলাবে।

চলতে চলতে একটু সময় চুপ্ করে থাকে সঞ্জয়। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, অভিনয় জানেন?

—অভিনয়? কিসের অভিনয়? জিজ্ঞেস করে জয়ন্তী।

জয়ন্তীর প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সঞ্জয় বললে, জানেন তো 'অফেন্স্ ইজ দি বেস্ট টাইপ অফ ডিফেন্স্। ওদের মুখোমুখি হয়ে আপনি এমন অভিনয় করবেন যেন আপনাকে আমার হেপাজতে রেখে ওদের চলে আসায় আপনার অসুবিধার একশেষ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে আসতে হয়েছে আমার সঙ্গে।

জয়ন্তী আর কোন জবাব না দেয়ে কেবল মৃদু হাসে।

গাড়োয়াল নিগমের যাত্রীদের মধ্যে ট্যুরিস্টলজে সবশেষে এসে পৌছল জয়ন্তী ও সঞ্জয়। ঘোড়সওয়ার যাত্রীরা এসে পৌছেছে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক আগে। ম্যানেজ-মাস্টার পরিতোষ এখানে পৌছেই লজের ম্যানেজারের সঙ্গে জমিয়ে নিয়ে লজের সব চাইতে বড় ও ভালো ঘরখানা অধিকার করে ফেলেছে। পাশাপাশি সাজানো অনেকগুলো খাট যাতে নাকি সাত-আট জন লোক অনায়াসেই শুতে পারে। বিছানা, কম্বল, বালিশ কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। রীনা ও মায়াও এসে পৌছেছে প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে।

লজে ঢুকে নিজেদের দলটির সন্ধান পেতে তেমন অসুবিধে হলো না। জয়ন্তী ও সঞ্জয় ঘরে ঢুকতেই ঘরে উপস্থিত পাঁচটি প্রাণীর মুখেই ফুটে উঠলো একটি কথা, এই যে, এসে পড়েছে।

জয়ন্তী ও সঞ্জয় খাটের কোণে বসে একটু হাঁপ ছাড়ে। পরিতোষ জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়কে, এত দেরি হলো কেন তোদের? আমরা সেই কখন থেকে তোদের জন্যে হা পিত্যেস করে বসে আছি। রীনা মায়াও তো এসে পৌছল অনেকক্ষণ আগে। ওদের জিজ্ঞেস করতেই বললে ওরা নাকি তোদের কোন খবরই জানে না।

—আমার তো দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল, এবার বলে ওঠে বনানী, পাহাড়ী রাস্তায় তো যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।

এতক্ষণে মুখ খোলে রীনা। জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললে, দেখালি বটে একখানা। আর একটু দেরি হলে এখানকার পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে নির্ঘাৎ খবর দিতে হতো। বাব্বাঃ, রাস্তায় হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব করতে করতে এলেও তো এর চাইতে তাড়াতাড়ি আসা যায়। তা, তোদের এত দেরি হলো কেন?

জয়ন্তীর বদলে তাকে দেখিয়ে জবাব দেয় সঞ্জয়, উনি তো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না। একবার তো পাথরে পা পিছলে—

সঞ্জয়ের কথা শেষ হবার আগেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বনানী ও উজ্জ্বলা, ওমা তাই নাকি? কি সর্বনাশ! কোথাও চোট্ লাগে নি তো?

—না—না, সবাইকে অবাক্ করে বলে ওঠে রীনা, চোট্ লাগার আগেই বোধহয় সঞ্জয়বাবু ওকে ধরে ফেলেছিলেন। তাই না?

রীনার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে মায়া, তুই জানলি কেমন করে?

হাল্কা হেসে জবাব দেয় রীনা, এ তো অতি সহজ। সঞ্জয়বাবুর মত একটা জলজ্যান্ত মানুষ সঙ্গে থেকে যে আমার এই বান্ধবীকে 'পতন ও মূর্চ্ছা' থেকে রক্ষা করবেন না তা' আমি বিশ্বাস করতেই পারি না। ঘরে ঢোকার সময় তো ওকে সামান্য খুঁড়িয়ে চলতেও দেখলাম না।

—ঠিক বলেছেন, বলতে থাকে সঞ্জয়, ঠিক সময় ওঁকে ধরে না ফেললে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যেতো।

মুখ টিপে হেসে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে রীনা আবার বললে, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন যে শরীরের কোথাও কোন চোট লাগে নি। হয়তো মনে ঐ জাতীয় কিছু লাগলেও লাগতে পারে।

জয়ন্তী ভ্রূ কুঁচকে রীনার দিকে তাকাতেই রীনা সাফাই গাইতে গিয়ে আবার বললে, আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার আশঙ্কায় মনের ওপর রি-এ্যাকশন তো হতেই পারে, কি বলেন বৌদি? কথার শেষে সমর্থনের আশায় বনানীর দিকে ঘাড় ফেরায় রীনা।

রীনার ঐ 'মনের ওপর চোট্' লাগার কথায় উপস্থিত সবাই মনে মনে হাসলেও মুখে কেউ কিছু বলে না। পরিতোষ দু'জনকে উদ্দেশ করে সঞ্জয়কে বললে, আর দেরি করিস্ না। এবার ওঠ। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেস্ হয়ে আয়। ঐ ওপাশে ছেলেদের—মেয়েদের আলাদা বাথরুম আছে। লজের ছেলেটাকে বলে গরম জল আনিয়ে নে। প্রত্যেকের জন্যে বরাদ্দ মাত্র একমগ করে গরম জল।

—হ্যাঁ যা, জয়ন্তীর কাঁধে হাত রেখে রীনা বললে, তাড়াতাড়ি ফ্রেস হয়ে আয়। এর মধ্যে আমাদের দু'বার চা হয়ে গেছে। তোরা এলে আর একবার হবে।

জয়ন্তী যদি এই সময় আর কিছু না বলে বাথরুমে চলে যেত তা'হলে হয়তো রীনার হাত থেকে আপাতত বেঁচে যেতো। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার সঞ্জয়ের বলা অভিনয়ের কথা মনে পড়তেই কৃত্রিম গম্ভীর মুখে সে রীনাকে বললে, বলিহারি তোকে! এতবড় স্বার্থপর তুই যে আমাকে ফেলে রেখে তুই ও মায়া দিব্বি তরতর করে চলে এলি! জানিস তো, আমি তোদের মত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না।

জয়ন্তীর চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে রীনা। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, তোকে একা ফেলে এসেছি বলে তোর খুব অসুবিধা হয়েছে। তাই না রে?

—হয়েছেই তো। জবাব দেয় জয়ন্তী।

—গোটা পথ একা খুব 'বোর' লেগেছে, কেমন?

—লেগেছেই তো।

—গোটা জার্নিটা একদম এন্‌জয় করতে পারিস্ নি। তাই না?

রীনার কথার ধরনে মনে মনে শঙ্কিত হয় জয়ন্তী। এমন শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে তো ও কখনও কথা বলে না। বিশেষ করে জয়ন্তীর অভিযোগের জবাব

এমনভাবে দেয়া রীনার মত বাক্‌পটু মেয়ের পক্ষে একেবারেই অবিশ্বাস্য। তাই সে এবার মৃদু কণ্ঠে বললে, এতটা রাস্তা তোরা সঙ্গে থাকলে কত আনন্দ হতো, বল্ তো।

—তার মানে এতটা রাস্তা তুই খুব নিরানন্দে এসেছিস্, কেমন?

জয়ন্তী আর কোন জবাব দেয় না, কিম্বা দিতে সাহস পায় না। এই বিচ্ছু মেয়েটাকে একদম বিশ্বাস নেই। কোন্ কথা কিভাবে ফস্ করে বলে ফেলে তাকে লজ্জায় ফেলবে তার ঠিক্ কি?

আশঙ্কা কিন্তু সত্য হয় জয়ন্তীর। মুখটিপে হেসে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে রীনা আবার বললে, তা'হলে তো সত্যিই পরীক্ষা করে দেখতে হয় এতটা রাস্তা আমাদের কাছে না পেয়ে তুই কতখানি নিরানন্দ হয়েছিলি।

কথাটা বলেই রীনা সঞ্জয়ের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে বললে, দিন তো মশাই আপনার ক্যামেরাটা।

হেসে জবাব দেয় সঞ্জয়, কেন, এটা দিয়ে এখানে কি করবেন?

—ছবি তুলবো না অবশ্যই, বলে ওঠে রীনা, কেবল ঐ ক্যামেরার ফিল্মের রিল্‌টা খুলে নিয়ে ওয়াশ করিয়ে দেখবো যে ওর মধ্যে জয়ন্তীর নিরানন্দ হয়ে থাকবার কোন প্রমাণ আছে কিনা।

রীনার কথায় ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়ে যায়। আমতা আমতা করে কি যেন বলতে যায় সঞ্জয়, আর লজ্জায় সংকুচিত হয়ে ওঠে জয়ন্তী।

বিকেলে আকাশের অবস্থা একটু ভালো হতেই ট্যুরিস্ট লজের অনেকেই হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়ে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে। কেউ কেউ আবার ঐ কাজটা পরের দিনের জন্যে মুলতুবি রেখে বিছানায় লেপ কম্বল চাপা দিয়েও শীতে কাঁপতে থাকে ঠক্‌ঠক্ করে।

কেদারনাথের মন্দিরে দর্শন ও পুজো দিয়ে সদলবলে লজে ফিরে আসে পরিতোষ। এই মুহূর্তে বড়ই তৃপ্ত তারা। এটুকুর জন্যেই এত প্রস্তুতি, এত পরিশ্রম। মন্দিরের সামনে গোটা দলের বেশ কয়েকটা ছবি নিয়েছে সঞ্জয়। এখানে কিন্তু দলের সবাই সিরিয়াস। আচার আচরণ, কথা-বার্তায় প্রত্যেকেই দারুণ সংযত। এ যে দেবতার স্থান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ এই কেদারনাথ। ধ্যান-গম্ভীর তুষারশৃঙ্গের পাদদেশে প্রাচীন এই মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালে ক্রোধীর ক্রোধ, লোভীর লোভ, রসিকের রস, সংসারীর সংসার এমনকি সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস পর্যন্ত ভুলে গিয়ে সেই বিরাটের কাছাকাছি টেনে নিয়ে যায় মানুষকে। ক্ষুদ্রতা থেকে সাময়িক মুক্তি। ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।

লজে ফিরে এসেই কিন্তু আবার যে কে সেই। মন্দিরের সামনে যে রীনা

এতটুকু চঞ্চলতা পর্যন্ত প্রকাশ করেনি সে-ই কিন্তু লজ্জে ফিরে এসে সঞ্জয়কে পাকড়াও করে প্রকাশ্যেই বলে ওঠে, আর রেখে-ঢেকে কি হবে, মশাই? আমার এই বান্ধবীর কেদারনাথ দর্শন সার্থক। নিগোশিয়েশন-কাম্-লভ ম্যারেজের বন্ধনে আপনারা যে অচিরেই আবদ্ধ হবেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের। তাই আমার একান্ত অনুরোধ আমার এই ছোট ক্যামেরায় এই কেদারে বসে আপনাদের যুগলের একখানা ছবি তুলি। কথাটা বলেই রীনা সমর্থনের আশায় পরিতোষ ও বনানীর দিকে তাকায়।

মৃদু হাসতে থাকে বনানী। পরিতোষও হেসে বললে, কি বলিস্, সঞ্জু? আপত্তির কি আছে? যা না, ঐ বরফের ঢিবিটার কাছে গিয়ে দু'জনে দাঁড়া। রীনা ওর ইচ্ছেমত তোদের ছবি তুলে নিক্।

মায়া এইসময় রীনাকে বললে, এ এক আন-কমন্ মোমেণ্ট্। এই আন্ কমন মোমেণ্ট্‌কে ধরে রাখতে তোর ঐ ছোট্ট কমন্ ক্যামেরার চাইতে সঞ্জয়বাবুর ক্যামেরাটা অনেক বেটার। ওয়েল্, সঞ্জয়বাবু, আপনি আপনার ক্যামেরাটা হ্যাণ্ডল্ করার তরিকা আমাকে একটু সমঝে দিন। রীনা ও আমি দু'জনেই এর সচ্ ব্যবহার করি।

—সচ্-ব্যবহার না রে, মায়াকে সংশোধন করে রীনা, সদ্‌ব্যবহার। মায়া হেসে বললে, ঠিক্, সদ্‌ব্যবহার—সদ্‌ব্যবহার।

এরপর শুরু হয়ে যায় ছবিতোলার পর্ব। বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে রীনা ও মায়া এমনভাবে সঞ্জয় ও জয়ন্তীর যুগল ছবি তুলতে থাকে যেন সদ্য বিবাহিতা একজোড়া যুবক যুবতীর ছবি তুলছে তারা। এমনিই খুশি খুশি মুখ সঞ্জয়ের, এমনিই ব্রীড়া-সংকুচিত দৃষ্টি জয়ন্তীর।

ছবি তোলা শেষ। বাইরের আলো কমে এসেছে। এবার আসরে নামে উজ্জ্বলা। রীনা ও মায়াকে কৃত্রিম ধমক্ দিয়ে বললে, তোরা তো ভারি স্বার্থপর! নিজেদের বান্ধবীর বেলায় গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। ছাদ্‌নাতলায় না যেতেই জোড়ে ছবি। আর আমাদের মধ্যে একটা পাকা জোড় থাকতেও তোদের সেদিকে নজর পড়ছে না।

কথাটা বলে উজ্জ্বলা পরিতোষ ও বনানীর দিকে হাসিমুখে তাকাতেই বনানী সলজ্জ কণ্ঠে কি যেন বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই তার ওপর চড়াও হয় রীনা। বনানীর হাত ধরে টানতে টানতে বলতে থাকে, এক্সকিউজ মি বৌদি, একেবারেই খেয়াল ছিল না। কৈ দাদা, আসুন। মামা-ভাগ্নের একসঙ্গে একটা রেকর্ড থেকে যাক্।

শেষ পর্যন্ত মেয়েদের পীড়াপীড়িতে পরিতোষ ও বনানীকেও এসে দাঁড়াতে

হলো ক্যামেরার সামনে।

মামা-ভাগ্নে এক খাটে। মেয়ে পাঁচজন ঘরের আর একদিকে। আব্রুর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রচণ্ড শীতের দাপটে প্রত্যেকেই দু'তিন খানা করে লেপ-কম্বলের তলায়। তা' সত্ত্বেও মেয়েদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে একখানা শাড়ি টাঙিয়ে আড়াল সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সারাদিনের ধকলের পরেও প্রচণ্ড শীতেব কামড়ে প্রথম দিকে কারুর চোখেই ঘুম আসছিল না। ঘরে একটা টিম্‌টিমে আলো। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়েই গল্পগুজব। অবশেষে একসময় নিদ্রা।

গভীর রাত। বাইরে একটা মৃদু গুঞ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল সঞ্জয়েব। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রেখেও কিছু বুঝতে পারলে না। তবে গুঞ্জনটা এই ট্যুরিস্ট লজের মধ্যেই।

কৌতূহলী সঞ্জয় আরও কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকে। অবশেষে একসময় সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ট্যুরিস্ট লজের লবিতে কয়েকজন যাত্রী। তাদের মধ্যে লজের কেয়ার-টেকার লোকটিও রয়েছে। সঞ্জয় সেখানে এসে দাঁড়াতেই কেয়ার-টেকার তাকে তাদের ঘরের নম্বর জিজ্ঞেস করে। সঞ্জয় নম্বর বলতেই নিজের হাতের কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে হিন্দীতে বলে ওঠে, আপনাদের রুমেও তো একটা শিগ্‌রি অর্থাৎ কয়লার উনুন আছে?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে সায় দিতেই লোকটি আবার বললে, শিগ্‌গির ওটা বাইরে সরিয়ে দিন। এমনিতেই এখানে এত উঁচুতে অক্সিজেনের অভাব। সারারাত ঘর গরম রাখার জন্যে ঘরে শিগ্‌রি রাখলে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অন্য একটা রুমে একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে।

বাস্তবিক, পরিতোষ কিম্বা তার নিজের এটা একেবারেই খেয়াল ছিল না। ঘর গরম রাখার জন্যে আলাদা টাকা খরচ করে পরিতোষই একটা কয়লার উনুনের ব্যবস্থা করেছিল।

সঞ্জয় ঘরে ফিরে গিয়ে নিঃশব্দে জলন্ত উনুনটা বাইরে লবির দরজার কাছে রেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাত-পা একটু সেঁকে নিতে থাকে।

হঠাৎ তার নজর পড়ে লবির কাঁচের জানালার ওপর। মোটা পর্দার ফাঁকে কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় সে। সকাল হয়ে গেল নাকি? নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকায় সঞ্জয়। রাত দু'টো। তা'হলে বাইরেটা এমন ফর্সা কেন?

কৌতূহলী সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে পর্দা সরাতেই যে দৃশ্য তার চোখের

সামনে ফুটে ওঠে তাতে সে অভিভূত হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। প্রকৃতি সৌন্দর্যময়ী নিঃসন্দেহে। কিন্তু সমতল থেকে সাড়ে বারো হাজার ফুট উঁচুতে তুষারাবৃত হিমালয়ের যে রূপ সেই মুহূর্তে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে তা' সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর। আকাশে এক ফোটা মেঘ নেই কোথাও। নীল আকাশের সেই চাঁদের জ্যোৎস্নায় যেন অবগাহন করছে নিচের শ্বেত-শুভ্র তুষারাবৃত চরাচর। দূরে কেদারনাথের মন্দিরের ঠিক পেছনেই তুষারাবৃত গিরিচূড়ায় জ্যোৎস্নার লুটোপুটি। যতদূর চোখ যায় কেবল জ্যোৎস্নাপ্লুত তুষারের শুভ্রতা।

বিস্ময়াবিভূত সঞ্জয় সেই অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। পরক্ষণেই শীতের কামড় উপেক্ষা করে লবির দরজা খুলে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

এবার আর জানালার কাঁচের বাধা নেই। বিশ্বপ্রকৃতির সেই অপার সৌন্দর্যের দিকে সরাসরি তার চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ তার মনে হলো, এমন সৌন্দর্য একা উপভোগ করার নয়। একাধিকের উপভোগ একের উপভোগের আনন্দকে বাড়িয়ে তুলবে বহুগুণ।

কথাটা মনে হতেই নিঃশব্দে লবির দরজা বন্ধ করে সঞ্জয় এসে ঢোকে নিজেদের ঘরে। একটু সময় চিন্তা করে। পরক্ষণেই পাহাড়ে চলার লাঠিখানা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় শাড়ির পার্টিশনের সামনে।

গভীর রাতের অন্ধকারে নিদ্রিতা মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেয়া যে কেবল শালীনতা বিরুদ্ধই নয়, একান্তই গর্হিত কাজ এ বোধ যথেষ্টই আছে সঞ্জয়ের। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে নিরুপায়। জয়ন্তীকে ডাকতেই হবে। ডেকে তুলে তাকে করে নিতে হবে ঐ সৌন্দর্য উপভোগের অংশীদার। তবে ভরসার মধ্যে এই যে মেয়েরা কেউ-ই তার দৃষ্টিগোচরের মধ্যে নয়। লেপ—কম্বলের তলায় প্রায় অদৃশ্য তারা।

মেয়েদের এই অদৃশ্য হয়ে থাকাটাই এক মস্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সঞ্জয়ের কাছে। এই পাঁচজন নিদ্রিতা নারীর মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষিতা নারী জয়ন্তী কোথায়? একজনকে ডাকতে গিয়ে আর একজনকে ডেকে ফেললেই তো মুশকিল।

বাইরের দেয়ালের গা ঘেঁসে যে সঞ্জয়ের ছোটমামী শুয়েছে তা' সে নিজের খাটে শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছিল। বনানীর গা ঘেঁসেই উজ্জ্বলা ও মায়া। কিন্তু ঐ জয়ন্তী ও রীনাকে নিয়েই সমস্যা। শোবার আগে এই দু'জনের মধ্যে পাশে শোয়া নিয়ে যে একটা ছোটখাটো খুনসুঁটি হয়েছিল তা টের পেয়েছিল সঞ্জয়। কিন্তু

তারপরে যে কি সমঝোতা হয়েছিল তা' সে জানে না। এবার ওপাশের ঐ লেপ-কম্বল মুড়ি দেয়া দেহ দুটির মধ্যে কোন্‌টা জয়ন্তীর তা' বেছে নেয়াই তো মুশকিল।

কিন্তু মুশকিল হলে চলবে না। বাইরের ঐ সৌন্দর্য দেখাতেই হবে জয়ন্তীকে।

পার্টিশন কাপড়ের এপাশে দাঁড়িয়ে লম্বা লাঠিটার ডগা দিয়ে খাটের পাশের দেহটিকে একবার আল্‌তো খোঁচা দেয় সঞ্জয়। বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে থাকে তার। জয়ন্তীর বদলে রীনা হলেই তো বিপদ। সব আয়োজন মাটি।

একবার—দু'বার—তিনবার। তৃতীয়বারে দেহটা একটু নড়েচড়ে ওঠে। উৎকণ্ঠা বোধ করে সঞ্জয়। কে হবে? কিন্তু না, আবার স্থির হয়ে যায় দেহটা।

চতুর্থবার মরিয়া হয়ে একটু জোরেই খোঁচা দেয় সঞ্জয়। এতক্ষণে কাজ হলো। দেহটা একটু জোরে নড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রীনার ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর, এই জয়ন্তী, পা দিয়ে আমাকে ঠেলছিস্‌ কেন? সরে শো। এবার জয়ন্তীর দেহখানি নড়ে ওঠে। আধো ঘুমের মধ্যে সে জবাব দেয়, আমি ঠেলবো কেন? স্বপ্ন দেখেছিস্‌। নে, ঘুমো।

এতক্ষণে কার্যসিদ্ধি হলো সঞ্জয়ের। একটু সময় সে চুপ্‌ করে থাকে। পরক্ষণেই সে আবার খোঁচা দেয় জয়ন্তীকে।

জয়ন্তীর খোঁচাটা বোধহয় একটু জোরেই হয়েছিল। তাই একবারেই কাজ হয়। নড়েচড়ে ওঠে জয়ন্তী। ঘুমন্ত ভারি কণ্ঠে এবার সে পাল্টা অভিযোগ আনে রীনার বিরুদ্ধে। এই রীনা, কি হচ্ছে? পা ছুঁড়ছিস্‌ কেন? কথাটা বলে জয়ন্তী লেপ-কম্বল টেনে আবার ঘুমোবার তোড়জোড় করতেই আবার সেই লাঠির খোঁচা।

এ তো পায়ের লাথি নয়! মুখের ওপর থেকে কম্বলখানা সরিয়ে নিয়ে চোখ মেলে তাকায় জয়ন্তী। আর তাকিয়েই বুকটা ধ্বক্‌ করে ওঠে তার। আলো-আঁধারিতে লাঠি হাতে শাড়িখানার ওপাশে দাঁড়িয়ে কে?

ধরমড করে বিছানায় উঠে বস্‌তে যায় জয়ন্তী। চিৎকার করতে গিয়েও পারে না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। আব ঠিক্‌ সেই মুহূর্তে লাঠিশুদ্ধ সঞ্জয়েব জোড়হাতের ভঙ্গি। পরক্ষণেই নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে জয়ন্তীকে না-চেঁচাতে অনুরোধ।

এতক্ষণে যেন মানুষটাকে চিনতে পেরেছে জয়ন্তী। ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে তার। সন্তর্পণে লেপ-কম্বল সরিয়ে বিছানায় উঠে বসে জয়ন্তী কৌতূহলী চোখে

তাকিয়ে থাকে সঞ্জয়ের দিকে। এই মাঝ রাত্তিরে শীতের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে মানুষটা কি বলতে চাইছে তাকে? হাতছানি দিয়ে ডাকছে কেন? আঙুল দিয়ে বাইরে দেখিয়ে কি বোঝাতে চায়? জয়ন্তী কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে, সঞ্জয় গোপনে কিছু বলতে চাইছে তাকে। তাই সে সন্তর্পণে খাট থেকে নেমে সারা গায়ে একটা মোটা র‍্যাপার জড়িয়ে এসে দাঁড়ায় শাডিখানাব পাশে।

সাবা মুখে হাসি ফুটিযে সঞ্জয় ফিস্ ফিস্ কবে বললে, একবার বাইরে এসো না।

—এই ঠাণ্ডায়, বাইবে? চাপা কণ্ঠস্বব জয়ন্তীর।

—আবে এসোই না, বলে ওঠে সঞ্জয়, একটা দারুণ জিনিস দেখাবো তোমাকে।

এই মুহূর্তে সঞ্জয় কি দারুণ জিনিস তাকে দেখাতে চাইছে তা জয়ন্তী জানে না। কিন্তু বুঝতে পাবে অন্যের অগোচরে সেই দারুণ জিনিসটা সঞ্জয় দেখাতে চাইছে একমাত্র তাকেই। কথাটা ভাবতেই মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে জয়ন্তীব। তবে, সেই আনন্দের সঙ্গে মিশে থাকে নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণের এক ধরনেব শঙ্কা মিশ্রিত লজ্জা। নিষিদ্ধই বটে। এই পরিবেশে স্বল্প পরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে তাব নিজেব মত একটি যুবতীব এই গোপন কথা বলা অবশ্যই নিষিদ্ধের পর্যায়ে পড়ে। হতে পারে সেই যুবক একদিন হবে তাব ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। কিন্তু তাই বলে আজ তো সে জয়ন্তীব কেউ নয়।

সঞ্জয় চাপা কণ্ঠে আবার তাডা দেয় জয়ন্তীকে, এসো। এসো না আমার সঙ্গে।

জয়ন্তী কিন্তু তবুও দাঁডিযে থাকে স্থিব হয়ে। সেই মুহূর্তে সঞ্জয়েব ঐ তুমি সম্বোধন কেমন যেন অসাড কবে তোলে তাব হৃদয়তন্ত্রীকে।

সঞ্জয় আবাব বললে, এই সময় একা আমাব সঙ্গে যেতে সংকোচ হচ্ছে?

একটু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ে জয়ন্তীব মুখে। গায়েব র‍্যাপারটা ঠিক্ করে নিয়ে কাঁপা গলায় চাপা স্বরে সে কেবল বললে, চলো।

নিঝুম রাত। আকাশের কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ। যতদুব চোখ যায় কেবল জ্যোৎস্নামাখা শুভ্র তুষার। প্রকৃতিব এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ কবতে একজোডা যুবক-যুবতী ট্যুরিস্ট লজেব খোলা বাবান্দায়ও আর নিজেদেব আটকে রাখতে রাজি নয়। তাই হাত ধবাধবি কার তাবা নেমে এসেছে নিচে। পায়ের নিচে তাদের নরম তুষার। অনেকটা নিজেদের অজান্তেই পবস্পরেব গা-ঘেসে তারা দাঁড়িয়ে বয়েছে প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা কবে। পবস্পবেব সান্নিধ্যেব উষ্ণতাই সেই মুহূর্তে তাদেব ভুলিয়ে দিয় পাহাড়ী শীতের অনুভূতি।

সঞ্জয় ও জয়ন্তী কতক্ষণ সেইভাবে হাত ধরাধরি করে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ তাদের পেছনে জেগে ওঠে একটা কৌতুক কণ্ঠস্বর, অনেক ভাগ্যে এমন অভিসার-রজনী লাভ করা যায়।

তাড়াতাড়ি পরস্পরের হাত ছাড়িয়ে সঞ্জয় ও জয়ন্তী একটু সরে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই তাদের চোখে পড়ে একটু দূরে আপদমস্তক কম্বলে ঢেকে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে রীনা।

(পাঁচ)

বাইরের বসার ঘরে পাত্রীদের বায়ো-ডাটার মধ্যে ডুবে ছিলেন মজুমদার সাহেব। পাত্রীর প্রথম লটের পরে দ্বিতীয় লটের বাছাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এমনি সময় একখানা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকে সাবিত্রী বললেন পরির চিঠি এসেছে।

টেবিলে রাখা কাগজপত্র থেকে চোখ সরিয়ে না নিয়েই মজুমদার সাহেব জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে লিখেছে?

—যোশী মঠ থেকে।

—কি লিখেছে?

জবাব দেন সাবিত্রী, কেদারনাথ দর্শন ওদের শেষ হয়েছে। এবার ওরা চলেছে বদ্রীনাথের পথে। আগামী শুক্রবার দুন এক্সপ্রেসে ওরা এসে হাওড়ায় পৌঁছবে।

—সবাই ভালো আছে তো? বনানী, সঞ্জু?

—হ্যাঁ, ভালো আছে।

একটু সময় চুপ্ করে থাকেন মজুমদার সাহেব। তারপর আবার বলতে থাকেন, বাব্বাঃ, এক ঝক্মারি ব্যাপার এই পাত্রী বাছাই। রুণুর বিয়ের ব্যাপারে পাত্রর সংখ্যা ছিল কম। তাই তেমন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সঞ্জুর বেলায় দেড়শো। তা'ছাড়া, এখনও মাঝে মাঝে সরাসরি দু'একখানা করে চিঠি আসছে। তাও তো, যারা জন্মছক্ পাঠায়নি তাদের কথা বিবেচনাই করছি না। তাতেই এই। বোঝ ব্যাপারখানা। এদেশের মেয়ের বাবারা কি এতকাল কেবল সঞ্জুর মত একটি পাত্রর জন্যেই বসেছিল?

জবাবে সাবিত্রী বললেন, তোমার বাপু আবার সবতাতেই একটু বাড়াবাড়ি। আগের দশটি পাত্রীর জন্ম-ছক্ বিচারের ফল তো পণ্ডিতমশাই এখনও জানাননি। আগে সেটা দেখ। তাদের মধ্যে কেউ যদি তোমার চাহিদা পূরণ করতে না পারে তখন না হয় তোমার ঐ চার্টের মধ্য থেকে অন্য মেয়ের

খোঁজ করবে। তা' নয়, আগেই দ্বিতীয় বাছাই নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছ।

সাবিত্রীর কথায় বিরক্তির স্বরে বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, তোমার আর কি? তুমি তো বলেই খালাস। কোনদিন তো আর এসব নিয়ে মাথা ঘামালে না। সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্বি রান্নাঘর নিয়ে মেতে রইলে। পাত্রী বাছাই যে কি কঠিন ব্যাপার! একজনের এটা ভালো তো ওটা মন্দ। অন্যজনের এটা মন্দ তো ওটা মন্দের ভালো। এসব বিচার বিবেচনা করে বাছাই করা তো আর রান্নাঘরে বসে খুন্তি নাড়া নয়।

স্বামীর কথায় সাবিত্রীও তেঁতে উঠে বলেন, বেশ তো, একবার এসো না রান্নাঘরে খুন্তি নাড়তে।

—এদিকের সব সামলাতে পারবে তুমি?

—না পারার কি আছে? তুমি তো কেবল সহজ জিনিসকে জটিল করে তোল। সোজাভাবে পাত্রী বাছাই করে কি কারুর ছেলের বিয়ে হয় না?

স্ত্রীর কথায় মজুমদার সাহেবের কণ্ঠস্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে সাবিত্রী বুঝতে পারেন এটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। বললেন মজুমদার সাহেব, সহজ জিনিসকে আমি কেবল জটিল করে তুলি, কেমন? এটাই আমার স্বভাব, তাই না?

সাবিত্রী কোন জবাব না দিয়ে চুপ্ করে থেকে মজুমদার সাহেবকে খানিকটা শান্ত হবার সুযোগ দেন। স্বামীর চরিত্র তাঁর অজানা নয়।

একসময় সত্যিই অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে মজুমদার সাহেব আবার বললেন, আসলে ব্যাপার কি জানো? সঞ্জুর দিল্লীতে ট্রেনিংয়ে যাবার তো বেশি দেরি নেই। তাই ভাবছিলাম দেখেশুনে যদি মনের মত একটি পাত্রী ইতিমধ্যে জোগাড় করতে পারি তা'হলে সঞ্জুকে দিয়ে একবার দেখিয়ে মোটামুটি ফাইন্যাল করে রাখতে পারবো। শত হলেও সঞ্জুর এ্যাপ্রুভ্যালটা তো নেয়া উচিত।

মজুমদার সাহেবের কথায় কোন জবাব না দিয়ে সাবিত্রী কেবল মৃদু হাসেন। তার সেই হাসি চোখে পড়তেই জিজ্ঞেস করেন মজুমদাব সাহেব, ওকি, হাসছো কেন?

একটু সময় চুপ্ করে থেকে জবাব দেন সাবিত্রী, তোমার নিজের এ্যাপ্রুভ্যালের ওপর সঞ্জুর এ্যাপ্রুভ্যাল? ওর সেই সাহস আছে নাকি?

স্ত্রীর কথায় মনে মনে খুশিই হন মজুমদার সাহেব। একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, তা' যা বলেছ। তবে কি জানো, ছেলের বয়স হয়েছে। লেখাপড়া করেছে। ওর নিজের মতামতটা তো একবার নেয়া উচিত।

সহর কলকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে নিজের বাড়িতে বসে মজুমদার সাহেব

যখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এজাতীয় আলোচনা করছিলেন তখন তুন এক্সপ্রেসের একটা থ্রি-টায়ার কামরায় বসে পরিতোষ, বনানী ও সঞ্জয়ের মধ্যে ঐ একই ব্যাপার অর্থাৎ সঞ্জয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা চলছিল। সাধারণত এই জাতীয় তীর্থদর্শন শেষে ফেরার পথে দলের মধ্যে ঐ তীর্থদর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচনা চলে। কারণ ওটাই ভ্রমণের লক্ষ্য। ঐ সংক্রান্ত আর যা কিছু সবই উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু পরিতোষের বেলায় উপলক্ষ্যটাই অর্থাৎ একজোড়া যুবক-যুবতীর রোমান্সটাই তাদের প্রায় লক্ষ্যচ্যুত করে ফেলেছিল। কেদারনাথ দর্শনের পরে বদ্রীনাথ দর্শন। তারপরে ঋষিকেশের সেই মুনি-কি-রেতিতে ফিরে আসা পর্যন্ত দিনগুলো জয়ন্তী ও সঞ্জয়ের এক স্বপ্নের আবেশের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল। এ যেন বিয়ের আগেই মধুচন্দ্রিমা। কিম্বা রথ দেখা কলা বেচার মত একসঙ্গে দলবেঁধে তীর্থভ্রমণ ও মধুচন্দ্রিমা। এ যেন দলের মধ্যে থাকার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেই, কিন্তু আবেশটুকু আছে। অন্যের চোখ এড়িয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসার চেষ্টায় সেই আবেশ যেন বেড়ে উঠেছিল অনেকগুণ। লুকিয়ে প্রেম করাকে যদি গর্হিত কাজ বলা হয় তা'হলে জয়ন্তী ও সঞ্জয়ের এই প্রেমপর্বকে হয়তো গর্হিত বলা চলে না, যেহেতু কলকাতায় তাদের অভিবাবকদের মধ্যে তখন বিয়ের ব্যাপারে তথ্যের আদান-প্রদান চলছিল।

পরিতোষ ও বনানী শত হলেও সঞ্জয়ের গুরুজন। কাজেই নিজেদের কৃতী ভায়ের এ জাতীয় কৃতিত্ব ঐ পাহাড়ী পরিবেশে মনে মনে উপভোগ করলেও মুখের ওপর ফুটিয়ে রাখতে হয়েছিল এক ধরনের উদাসীন ভাব। দেখেও না দেখার ভান। জয়ন্তীকে তাদেরও পছন্দ হয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তারা যদি জানতে পারে যে মজুমদার সাহেব এই মেয়েটিকেই পছন্দ করেছেন তা'হলে অনেকের চাইতেই বেশি খুশি হবে তারা। তবে মজুমদার সাহেবকে তাঁর এই শ্যালক ভালই চেনে। বড়ই একগুঁয়ে মানুষ তিনি। নিজের ভাবনা-চিন্তার ব্যতিক্রমের সঙ্গে একেবারেই কম্প্রোমাইজ করতে জানেন না মজুমদার সাহেব। ভাঙবেন তিনি কিন্তু মচকাবেন না কিছুতেই। পরিতোষদের দলের বাকি সদস্যরা অর্থাৎ উজ্জ্বলা, রীনা ও মায়ার এই তীর্থদর্শন তো এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তীর্থদর্শনে এসে তাদের প্রিয় বান্ধবীর এই প্রেম-উপাখ্যান তাদের ভ্রমণের তৃপ্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছিল বহুগুণ। হাসিঠাট্টা, ইয়ার্কি-ফাজলামিতে গোটা দলটিকেই তারা চাঙ্গা করে রেখেছিল এই ক'টা দিন। পথের ক্লান্তি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সবাই।

পথচলার শেষে ছাড়াছাড়ির পালা। ঋষিকেশ থেকে হরিদ্বার এসে সেখান থেকে তুন এক্সপ্রেস ধরবে পরিতোষেরা, আর ওখান থেকেই সোজা দিল্লির বাস

ধরবে উজ্জ্বলারা। ওরা কলকাতায় ফিরবে দিল্লী হয়ে। হিমালয়ের কোলে যে দলদু'টি এক হয়ে মিশে গিয়েছিল তারা এবার বিছিন্ন হয়ে ধরবে যে যার পথ। দু'দলের মনেই কেবল থেকে যাবে হিমালয় ভ্রমণের স্মৃতি। তবে জয়ন্তী ও সঞ্জয়ের মনে থেকে যাবে ঐ স্মৃতির বাইরে আরও কিছু—আবও অনেক কিছু যা নাকি ওদের মত একজোড়া নর-নারীর কাছে অনেক অনেক দামী।

হরিদ্বারে পরিতোষদের ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল উজ্জ্বলারা। জয়ন্তী প্রথমে স্টেশনে আসতে চায়নি ওদের সঙ্গে। একরকম জোর কবেই তাকে নিয়ে এসেছিল রীনা। বলেছিল, চল্ না স্টেশনে। হোটেলে একা বসে বসে গঙ্গার শোভা দর্শনের চাইতে সেখানে একটি মানুষের মুখ-শোভা দেখার জন্যে তোর মনটা যে ছট্‌ফট্ করছে তা' আমি অনায়াসেই বলে দিতে পারি।

লজ্জায় জয়ন্তীর ফর্সা গাল দু'খানি লাল হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। বলে উঠেছিল মায়া, ভরো মৎ জয়ন্তী। তোকে আমরা গ্যারাণ্টি দিচ্ছি ট্রেন ছাড়ার সময় তোর চোখ-মুখের চেহাবা দেখতে আমরা তোর দিকে তাকাবো না।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্যরকম। ধীরে ধীরে ট্রেনটা প্লাট্‌ফর্ম থেকে সরে যাচ্ছে, আর পরিতোষদের দিকে তাকিয়ে আছে চারটি যুবতী। বিচ্ছেদ-ব্যথায় তাদের প্রত্যেকের চোখই সজল। ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই রীনা জয়ন্তীর একটা হাত চেপে ধরে গাঢ় কণ্ঠে কেবল বলেছিল, চল্ এবার। সেই মুহূর্তে রীনার নিজের কণ্ঠস্বরেই যেন ঝরে পড়েছিল তার প্রিয় বান্ধবীর হৃদয়-বেদনা।

হু-হু করে ছুটে চলছে এক্সপ্রেস ট্রেন। কামরার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা সঞ্জয়ের ভারাক্রান্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পরিতোষ মৃদু হেসে সঞ্জয়ের কান বাঁচিয়ে কথা বলার কৃত্রিম প্রচেষ্টায় স্ত্রী বনানীকে বললে, বুঝলে হে, গতিক কিন্তু সুবিধের নয়।

স্বামীর কথার জবাবে হালকা সুরে বনানী বললে, এতে সুবিধা-অসুবিধার আর কি আছে? পাত্রী আমরা দেখেছি। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি এই ক'টা দিন। আমরাই ফিরে গিয়ে জামাইবাবুকে বলবো যে এমন একটি পাত্রী আর হয় না। দেখতে-শুনতে, স্বভাব-চরিত্রে তোমার এই ভাগ্নের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পাত্রী পছন্দ করে যেখানে বিয়ে হয় সেখানে বিয়ের আগে পাত্রীর সঙ্গে এমন মেলামেশার সুযোগ কোথায় পাওয়া যায়, বলো? তা'ছাড়—

কথাটা শেষ না করেই স্বামীর দিকে একটু অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বনানী মৃদু হাসতেই পরিতোষ তেমনি সুরেই জিজ্ঞেস করে, তা'ছাড়া আবার কি?

আড়চোখে একবার সঞ্জয়কে দেখে নিয়ে বনানী বললে, দেখ বাপু, আমার

কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। সত্যি কথাটা সোজাভাবেই বলছি। আমাদের পছন্দ তো হয়েছেই, এমনকি খোদ পাত্রটিও তাকে পছন্দ করে বসে আছে।

—সর্বনাশ, চুপ্-চুপ্! হঠাৎ কথাটা এমনভাবে পরিতোষ বলে ওঠে যে বনানীর সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ও ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় তার ছোট মামার দিকে। চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলতে থাকে পরিতোষ, সাবধান, এই কথাটা যেন জামাইবাবুর কানে না ওঠে। আমাদের পছন্দ হয়েছে, ঠিক্ আছে। কিন্তু সঞ্জুর পাত্রীকে পছন্দ হয়েছে, এ কথাটা জামাইবাবু জানতে পারলে তিনি নির্ঘাৎ ক্ষেপে উঠবেন। হয়তো বলে বসবেন, কী, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া! আমি দেখলাম না শুনলাম না, তার আগেই সঞ্জু পাত্রী পছন্দ করে বসে রইলো? তুই কি বলিস্ সঞ্জু? আমি ঠিক্ বলিনি? পরিতোষ প্রশ্নটা সঞ্জয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে আলোচনায় টেনে আনতে চায়।

একটু সময় দ্বিধা করে সঞ্জয়। তারপর তার ছোটমামার দিকে ফিরে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, বোধহয় তাই।

—বোধহয় কিরে? বলে ওঠে পরিতোষ, নির্ঘাৎ তাই। তোর বাবাকে তো তোর জন্মের আগে থেকেই আমি চিনি।

হেসে বনানী তার স্বামীকে বললে, কি বলছো গো, তুমি? ছেলের বাপকে ছেলের চাইতে তুমি বেশি চেনো?

—আলবৎ! জবাব দেয় পরিতোষ, মজুমদার সাহেবের সঙ্গে কার আগে পরিচয় হয়েছে? সঞ্জুর না আমার?

এবার বনানীর সঙ্গে সঞ্জয়ও হাসে। বলতে থাকে পরিতোষ, তবে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়া আছে।

—ফাঁড়া? কৌতুহলী কণ্ঠস্বর বনানীর, কার ফাঁড়া? কিসের ফাঁড়া?

—আমার নয়। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। হেসে বলে ওঠে পরিতোষ।

—হেঁয়ালী ছাড়ো তো! স্বামীকে প্রায় ধমকে ওঠে বনানী, কার ফাঁড়া সেটাই আগে বলো না।

হেসে উঠে পরিতোষ বললে, বিয়ের—বিয়ের ব্যাপারে ফাঁড়া।

একটু থেমে পরিতোষ আবার বলতে থাকে, রঞ্জুর বিয়ের ব্যাপারে তো জামাইবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখেছি। রাজযোটক—রাজযোটক বলে একেবারে অস্থির। শেষ পর্যন্ত ঐ রাজযোটক যোগাড় করেই ছাড়লেন। অবশ্য বলতে নেই, রঞ্জুর বিয়েটা ভালই হয়েছে। তাই ভাবছি, কোষ্ঠি বিচারে জয়ন্তীর সঙ্গে যদি সঞ্জুর রাজযোটক না হয় তাহলে কি হবে? রাজযোটক না হলে যে

জামাইবাবু কোন মেয়েকেই ঘরে আনবেন না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

—আমরা সবাই মিলে জামাইবাবুকে বোঝাবো। বনানী বললে।

জবাব দেয় পরিতোষ, ফ্রুটলেস্—একেবারেই নিষ্ফল। কোষ্ঠি বিচারে যে রাজযোটক হতে হবে এটাই জামাইবাবুর প্রাইমারি ডিম্যাণ্ড্। এছাড়া তার আর কি কি ডিম্যাণ্ড আছে জানি না।

একটু ভেবে পরিতোষ এবার জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়কে, হ্যাঁরে সঞ্জু, তুই জানিস্, জয়ন্তীর জন্মছকের যোটক বিচার হয়েছে কিনা?

বেশ স্বাভাবিক সুরেই এবার জবাব দেয় সঞ্জয়, না, জানিনা। কলকাতা ছাড়ার আগে বাবার সেই মস্ত চার্টে কয়েকটি মেয়ের নামের পাশে লাল কালির লেখা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে কেবল ঐ পাত্রীদের জন্ম-ছক্গুলোই জ্যোতিষীর কাছে যাবে।

—ওদের মধ্যে জয়ন্তীও রয়েছে, কেমন?

সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়ে সঞ্জয়।

একটু চিন্তা করে পরিতোষ আবার বললে, শোন্ সঞ্জু, দিল্লী যেতে তো তোর এখনও প্রায় মাস খানেক দেরি আছে, কেমন?

এবারেও মাথা নেড়ে সায় দেয় সঞ্জয়। উপদেশের সুরে বলতে থাকে পরিতোষ, শুনেছি তোর বাবার কাছে তাঁর সেই জ্যোতিষী নাকি সাক্ষাৎ পরাশর মুনি। তাঁর গণনা নাকি অভ্রান্ত। আরও শুনেছি মানুষটি নাকি একটু অলস প্রকৃতির। তাই এত তাড়াতাড়ি যে তিনি বিচারের ফলাফল তোর বাবাকে জানাবেন মনে হয় না। বাড়িতে একটু চোখকান খোলা রেখে চলবি। যোটক বিচারের রেজাণ্ট্ সম্পর্কে চেষ্টা করবি ওয়াকিবহাল থাকতে, বুঝলি?

সঞ্জয় সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে কেবল চুপ্ করে থাকে।

বেলা দুপুর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে একটা ঝাঁকড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে পাশাপাশি বসে মানিকতলার ছেলে সঞ্জয় ও নাকতলার কলেজ-পালানো মেয়ে জয়ন্তী। বিজ্ঞান বলে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি হাওয়ার ঘনত্ব নাকি বেশি। প্রেমের ঘনত্বও বোধহয় তাই। সুউচ্চ হিমালয়ের বুকে একজোড়া নরনারীর মধ্যে যে প্রেমের প্রথম বিকাশ তা' মাত্র কয়েকটি দিনের মধ্যেই কলকাতার সমতল ভূমিতে আরও ঘন হয়ে উঠলো।

জয়ন্তী বললে, কাল বিকেলে আমার বাবার কাছে তোমার বাবার একটা চিঠি এসেছে।

কথাটা কানে যেতেই সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়, তাই নাকি?

কি লিখেছেন আমার বাবা ?

জবাব দেয় জয়ন্তী, লিখেছেন যে তোমার জন্ম-ছকের সঙ্গে যোটক বিচার করতে আমার জন্ম-ছকটা নাকি তিনি জ্যোতিষীর কাছে পাঠিয়েছেন। জ্যোতিষীর জবাব এলেই তিনি খবরটা আমার বাবাকে জানাবেন।

মনে মনে একটু আশ্বস্ত হয় সঞ্জয়। যাক্, জ্যোতিষীর কাছ থেকে তা'হলে এখনও কোন খবর আসে নি। তবে এলেও সঞ্জয়ের চোখ এড়াতে পারবে না। ইদানীং সঞ্জয় তার বাবার অনুপস্থিতিতে নিয়মিত বাইরের ঘরে তার বাবার টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে।

জিজ্ঞেস করে জয়ন্তী, আচ্ছা, তোমার বাবা তো নাকি একটু বিলিতি চাল-চলনে অভ্যস্ত মানুষ। আবার তিথি, নক্ষত্র, কোষ্ঠি বিচার ইত্যাদির ওপরেও দেখছি তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। ব্যাপারটা কেমন যেন একটু পরস্পর বিরোধী না ?

—কেন ? জবাব দেয় সঞ্জয়, বিলেতের মানুষের বুঝি জ্যোতিষের ওপর বিশ্বাস নেই ?

—না—না, আমি ঠিক তা' বলছি না। আধুনিক ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে ঐ হাত-দেখা কোষ্ঠি-বিচার ইত্যাদির সম্পর্ক নাকি তেমন ভালো নয়। একালের মানুষেরা ওসব নাকি ঠিক্ বিশ্বাস করতে চায় না।

একটু সময় চুপ্ করে থাকে সঞ্জয়। তারপর মৃদু হেসে জবাব দেয়, আমার মনে হয় বিলেতি চাল-চলনের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আসলে ব্যাপার কি জানো, আমার বাবা বাস্তবিকই বিলিতি চাল-চলন পছন্দ করেন। তা'ছাড়া বেশ গম্ভীর প্রকৃতির তিনি। কিন্তু এসবই তাঁর বাইরের আবরণ। ভেতরে ভেতরে বাবা এখনও পড়ে আছেন সেই পুরানো যুগে। পুরানো ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে থাকতে এখনও পছন্দ করেন তিনি।

—তোমার বাবাকে বুঝি খুব ভয় করো তুমি ?

জবাব দিতে গিয়ে সঞ্জয়ের মুখে সামান্য বিব্রতভাব ফুটে ওঠে। সেই ভাবটুকু লুকোতে চেষ্টা করে ঠোঁটের কোণে এক চিল্‌তে হাসি ফুটিয়ে সে জবাব দেয়, ভয় ? তা' একরকম ভয়ই বলতে পারো। আসলে ভয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ইত্যাদির এমন এক সংমিশ্রণ যা নাকি অনুভব করা গেলেও অন্যকে বোঝানো যায় না। জানি, আমার বাবা হচ্ছেন একটা নারকেলের মত। বাইরেটা শক্ত কিন্তু ভেতরটা নরম। কিন্তু অভ্যাসের দোষেই বল, আর অন্য কোন কারণেই বল, বাবার সামনে মুখ তুলে কথা বলতে ঠিক ভরসা পাই না।

—কেন, রাগারাগি করবেন বলে ?

—না, দুঃখ পাবেন বলে।

ঠিক্ এই সময় গাছের একটা শুক্‌নো পাতা ঝরে পড়ে সঞ্জয়ের মাথায়। জয়ন্তী হাত বাড়িয়ে পাতাটা সরিয়ে দিতে দিতে বললে, জানো, মাঝে মাঝে আমার খুব ভয় করে।

—কিসের ভয়? জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়।

জবাব দিতে একটু সময় নেয় জয়ন্তী। তারপর বললে, তোমার সঙ্গে আমার ঠিকুজির যদি মিল না হয়?

মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে সঞ্জয়ের। কিছুক্ষণ সে কোন জবাবই দিতে পারে না। এই ভয় তার নিজেরও। এমন একটা পরিস্থিতিতে যে সে কি করবে তা' সে অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারে নি। সেই অবস্থায় জয়ন্তীকে বাদ দিয়ে অন্য একটি মেয়েকে নিজের জীবন-সঙ্গিনী করার কথা মনে হলেই একজাতীয় বিতৃষ্ণায় তার মনটা রি—রি করে ওঠে। মনে মনে বলে, না, তা' একেবারেই সম্ভব নয়। জয়ন্তীর জায়গায় সে আর কাউকে বসাতে পারবে না। হয় জয়ন্তী, নয় তো আর কেউ নয়। প্রয়োজনে সে বিয়ে না করে সারাজীবন একা থাকতেও রাজি।

স্কুল-কলেজের কৃতী ছাত্র সঞ্জয় এতকাল তার ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল একমাত্র বইয়ের ওপর। এর বাইরেও যে ভালবাসার মত আর কিছু আছে তা' সে খেয়ালই করেনি এতকাল। বইয়ের পাতা ভেদ্ করে স্ত্রী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের রোমান্স কোনদিনই ঘেঁসতে পারেনি সঞ্জয়ের কাছে। তাই এদিকটা এতকাল সম্পূর্ণ অজানাই ছিল তার। হিমালয়ের পথে মন জুড়ানো এক ঝলক্ হাওয়ার মত জয়ন্তীই সর্বপ্রথম এসে আঘাত করলো তার মনের জানালায়। আর তাতেই অকস্মাৎ আত্মহারা হয়ে সঞ্জয় আবিষ্কার করলো যে ঠিক্ এই বস্তুটির জন্যেই যেন সে এতকাল অপেক্ষা করেছিল। তাই রাজযোটক না হওয়ার অপরাধে জয়ন্তী যে তার জীবন থেকে সরে যেতে পারে এমন একটা সম্ভাবনা মাঝে মাঝে দিশেহারা করে তোলে সঞ্জয়কে। রাজযোটক না হলে তার বাবা কিছুতেই জয়ন্তীকে পুত্রবধু হিসেবে বরণ করবেন না। সেক্ষেত্রে সঞ্জয় কি করবে?

সঞ্জয় জয়ন্তীর একখানা হাত নিজের কাছে টেনে নিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বললে, মিল না হলে যে কি হবে তা' এই মুহূর্তে আমি কল্পনাও করতে পারি না। বাবার মনে কষ্ট দেয়াও যেমনি আমার পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি তোমার কাছ থেকে সরে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব।

জয়ন্তীর একখানা হাত তেমনি ভাবে ধরে রেখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে সঞ্জয়। তারপর একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বললে, দেখা যাক্ শেষ পর্যন্ত কি হয়। আমাদের এই ভালোবাসার সঙ্গে বাবার রাজযোটকের

লড়াইটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

একটি একটি করে দিন কাটতে থাকে, আর আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে সঞ্জয় ও জয়ন্তী। মজুমদার সাহেবের সেই বৃদ্ধ জ্যোতিষী যেন বিচারক। আর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সঞ্জয় ও জয়ন্তী। ঐ বিচারকের হুকুমের ওপরেই যেন নির্ভর করছে সঞ্জয় ও জয়ন্তীর বাঁচা-মরা।

অবশেষে একদিন এলো সেই বিচারকের হুকুম। ঠিক্ হুকুম নয়, খোদ্ বিচারক নিজেই একদিন এসে হাজির হলেন মজুমদার সাহেবের বাড়িতে। বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ, চোখে নিকেলের চশমা, কালো লম্বাটে গড়ন, মাথার চুল সবই সাদা। পরনে ধুতি-কুর্তা, পায়ে চটি, এই বেশে এসে উপস্থিত হলেন সেই জ্যোতিষী একটা রিক্সায় চেপে।

খোদ্ মজুমদার সাহেব বাইরে এসে জ্যোতিষীকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। বেশ আয়েস করে সোফায় বসতে বসতে জ্যোতিষী খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি সমেত নিজের গাল চুলকে একটু হেসে বললেন, লোক মারফৎ খবর না পাঠিয়ে নিজেই চলে এলাম।

—খুব ভালো করেছেন, জবাব দেন মজুমদার সাহেব, এবার খবর বলুন। যোটকবিচার আপনার শেষ হয়েছে, পণ্ডিতমশাই ?

—বিলক্ষণ—বিলক্ষণ, মুখের অবশিষ্ট দাঁতকটা বের করে একটু হাসেন সেই পণ্ডিতমশাই। তারপর বলতে থাকেন, ভালো খবর বলেই তো নিজে এলাম।

—ভালো খবর! মনে মনে খুশি হন মজুমদার সাহেব। বললেন, দশটি পাত্রীর কারুর সঙ্গে মিলেছে ?

—মিলেছে মানে? দারুণ মিলেছে। চমৎকার রাজযোটক। বিচার করতে করতে আমার মনে হয়েছিল যেন আপনার পুত্রের জন্যেই কেবল এই পাত্রীটিকে ঈশ্বর তৈরি করেছেন।

—তাই নাকি? মনের আনন্দ আর চেপে রাখতে পারেন না মজুমদার সাহেব। এত সহজে যে পাত্রী নির্বাচন করতে পারবেন তা' তিনি ভাবেন নি। রঞ্জুটা বডই বেগ দিয়েছিল। সেই তুলনায় সঞ্জুর ব্যাপারটা তো জলভাত শ'দেড়েক পাত্রীর শ্রেষ্ঠ দশটির মধ্যে একটির সঙ্গে একেবারে রাজযোটক পয়লা রাউণ্ডেই ফয়সলা। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন মজুমদার সাহেব, কোন্ পাত্রীটির সঙ্গে রাজযোটক হয়েছে, পণ্ডিতমশাই ?

ফতুয়ার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন, কদমতলার নরেশ রায়চৌধুরীর কন্যা অবন্তী সর্বসুলক্ষণা পাত্রী। জন্ম-ছকই বলে দিচ্ছে পাত্রীটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

—তাই নাকি? মজুমদার সাহেব তাড়াতাড়ি তাঁর টেবিল থেকে পাত্রীর লম্বা চার্টখানা তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলে ওঠেন, এই তো—এই তো অবন্তী রায়চৌধুরী, পিতা নরেশ রায়চৌধুরী; হাওড়ার কদমতলার বাসিন্দা। ভদ্রলোক বিজনেস্‌ম্যান। পাত্রী এম্‌-এ পাশ। দেখতে শুনতে খুবই ভালো। সঙ্গীতে, নৃত্যে—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ পাত্রীটির সঙ্গেই রাজযোটক হয়েছে। বললেন, পণ্ডিতমশাই।

মজুমদার সাহেব লাল পেন্সিল দিয়ে অবন্তীর নামের পাশে যুৎসই ভাবে একটা তারকা চিহ্ন বসিয়ে দেন। তারপর লিস্টের মধ্যের বাকি নয়টি মেয়ের নামের পাশে একটি করে ক্রশ্‌ চিহ্ন দিয়ে জ্যোতিষীকে বললেন, ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে এত তাড়াতাড়ি একটি রাজযোটক পাত্রীর খোঁজ পাওয়া গেল। এদের সঙ্গে এখন যোগাযোগ করবো। পছন্দ হলে তো কথাই নেই, না হলে তখন এই লিস্ট থেকে আর দশটি পাত্রীর জন্মচক্র আপনাকে পাঠাবো পণ্ডিতমশাই।

-বিলক্ষণ—বিলক্ষণ। মাথা নেড়ে সায় দেন পণ্ডিতমশাই। বলতে থাকেন, খুবই সুখের কথা, কন্যার বেলায় যে ভোগান্তি আপনার হয়েছিল পুত্রের বেলায় তা' হলো না। বুঝলেন কিনা, সবই ভবিতব্য।

মজুমদার সাহেব টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখানা একশ' টাকার নোট বের করে জ্যোতিষীর হাতে দেন। নোটখানি যত্নসহকারে ভাজ করে ফতুয়ার পকেটে রেখে জ্যোতিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা'হলে আমি এবার চলি?

—হ্যাঁ, আসুন। মজুমদার সাহেবও উঠে দাঁড়ান।

পরের দিন দুপুরে জয়ন্তী কলেজ পালিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে তাদের সেই নির্দিষ্ট ঝাঁকড়া গাছটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করে সঞ্জয় গাছের গুঁড়ি ঠেস্‌ দিয়ে আকাশের দিকে উদাসীন চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে এসে বসে তার পাশে। সশব্দে কাঁধের ব্যাগটা রেখে দেয় ঘাসের ওপর। কিন্তু সঞ্জয় তখনও মৌন। এমনকি জয়ন্তীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় না পর্যন্ত।

বিস্মিত জয়ন্তী এবার সঞ্জয়ের গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে, ওকি, এভাবে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে কার ধ্যান করছো তুমি?

এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে জয়ন্তীর দিকে তাকায় সঞ্জয়। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিচু কণ্ঠে জবাব দেয়, অবন্তীর।

—অবন্তীর? সে আবার কে? চমকে ওঠে জয়ন্তী।

আবার একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সঞ্জয় বললে, জানিনা সে কে। তাকে চিনিও না। তবে আমার ঘাড়ে সেই অবন্তীকে চাপাবার জন্যেই বাবা তোড়জোড শুরু করেছেন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর সুন্দর মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। কিছু না বলে কেবল স্থির হয়ে বসে থাকে সে।

বলতে থাকে সঞ্জয়, বাবার সেই জ্যোতিষী কাল আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। কোষ্ঠি-ঠিকুজী বিচার করে তিনি নাকি দেখেছেন যে হাওডার কদমতলার কোন্ এক ব্যবসায়ী নরেশ রায়চৌধুরীর মেয়ে অবন্তী রায়চৌধুরীর সঙ্গেই নাকি আমার কোষ্ঠিব বাজযোটক মিল হয়েছে। বাকি ন'টি মেয়ের সঙ্গেই গরমিল। আর, এই বাকিদের মধ্যে তুমিও আছো।

কোন জবাব না দিয়ে জয়ন্তী আগের মতই ম্লান মুখে বসে থাকে। এবার তার নিজের দৃষ্টিই আকাশের দিকে।

গাছেব গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে পাশাপাশি একজোড়া যুবক-যুবতী। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক ভীষণ জালে জডিয়ে পড়ে তারা দু'জনেই দিশেহারা।

নীরবতা ভঙ্গ করে একসময় সঞ্জয় বললে, ওকি, তুমি চুপ্ করে বসে আছো কেন? কিছু বলো?

ধীবে ধীবে মুখ ঘুরিয়ে সঞ্জয়ের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় জয়ন্তী। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আমি আর কি বলবো?

—কি বলবো মানে? খানিকটা উত্তেজিত স্বরেই বলে ওঠে সঞ্জয়, কাল থেকে ভেবে ভেবেও তো কোন পথের সন্ধান পাচ্ছি না। এদিকে তুমিও কিছু বলবে না। তা'হলে কি শেষ পর্যন্ত ঐ অবন্তীই চাপবে আমার ঘাড়ে?

ম্লান কণ্ঠে জয়ন্তী বললে, তা'ছাড়া তোমার আর উপায় কি বলো? তুমি তো আর তোমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারো না। আমার জন্ম-ছক তোমার সঙ্গে মেলেনি, আব ঐ মেয়েটিব মিলেছে। কাজেই তোমাব বাবা তো তাব দিকে ঝুঁকবেনই।

—সবই তো বুঝতে পারছি। কিন্তু—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সঞ্জয়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, একবাব ছোটমামার কাছে গেলে কেমন হয়?

পরিতোষের কথায় মনটা যেন খানিকটা চাঙ্গা হযে ওঠে জয়ন্তীর। জবাব দেয়, যেতে পারো একবার। তবে তিনিও কি পারবেন তোমার বাবার মত পাল্টাতে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সঞ্জয়। নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে

না, আর দেরি নয়। এখনই চলো।

—ওমা, আমি কোথায় যাবো? সঞ্জয়ের দেখাদেখি জয়ন্তীও উঠে দাঁড়িয়ে বললে।

—কেন, আমার সঙ্গে ছোটমামার ওখানে যাবে।

—বলছ কি তুমি? এভাবে নিজের বিয়ের তদ্বির করতে কোন মেয়ে পারে নাকি?

—না—না, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলবো। তুমি শুধু থাকবে আমার সঙ্গে।

—ছি—ছি, কি লজ্জা! লক্ষ্মীটি, তুমি একাই যাও। আমাকে আর লজ্জার মধ্যে ফেলো না। জয়ন্তীর গলায় অনুনয়ের সুর।

—লজ্জা? কিসের লজ্জা? ছোটমামার কাছে আবার লজ্জা কি? আচ্ছা মেয়ে তো তুমি! সমস্যা আমাদের দু'জনের, আর তার সমাধান করতে ছুটতে হবে আমাকে একা?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় টেনে জয়ন্তীকে নিয়ে পরিতোষের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয় সঞ্জয়। তাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে আনন্দে হৈ-হৈ করে ওঠে পরিতোষ। বনানী হেসে বললে, জোড়ে এসেছ যে! সব কিছু ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেছে নাকি?

ম্লান হেসে জবাব দেয় সঞ্জয়, আর ঠিক্‌ঠাক্। সবকিছু যে এদিকে ভেস্তে যেতে বসেছে।

জিজ্ঞেস করে পরিতোষ, কেন রে, কোষ্ঠি বিচারে জামাইবাবুর ধনুর্ভঙ্গ পণ সেই রাজযোটক হয় নি বুঝি?

মাথা নাড়ে সঞ্জয়। বলতে থাকে পরিতোষ, আমি কিন্তু ঠিক্ এই আশঙ্কাই করেছিলাম। এখন তবে উপায়?

সঞ্জয়ের বদলে এবার বনানীই স্বামীর কথার জবাব দেয়, সেই উপায়ের জন্যেই তো এরা এসেছে তোমার কাছে। যে করেই হোক্ জামাইবাবুকে রাজি করাতেই হবে।

—অসম্ভব, বলে ওঠে পরিতোষ, রাজযোটক থেকে জামাইবাবুকে সরানো একেবারেই অসম্ভব।

—তা হলে? বনানী তাকিয়ে থাকে পরিতোষের দিকে।

সোফায় মুখোমুখি বসে মামা-ভাগ্নে। অন্যপাশে বনানী ও জয়ন্তী। নিজের বিয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভায় নিজের উপস্থিতিতে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল সে। কোন কথা না বলে কেবল মাথা নিচু করে বসেছিল। স্বামীর চরিত্রের সঙ্গে বনানী পরিচিত। পরিতোষকে বাঁ হাতে নিজের থুতনিতে হাত বুলোতে

দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল পরিতোষ গভীর ভাবে কিছু ভাবছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে একটু নড়েচড়ে বসে পরিতোষ জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়কে, প্রথম লটের দশটি মেয়ের একটির সঙ্গেও তোর কোষ্ঠি মেলে নি?

—না ছোটমামা, মাত্র একজনের সঙ্গে মিলেছে।

—ওরে বাবা, সমস্যার ওপর সমস্যা! তা' সেই ভাগ্যবতীর পরিচয় কি?

—হাওড়ার কদমতলার এক ব্যবসায়ীর মেয়ে। নাম অবন্তী রায়চৌধুরী।

—বাঃ—বাঃ, জয়ন্তীর সঙ্গে অবন্তীর প্রতিযোগিতা। তা', পাত্রীর বাবার নাম?

—নরেশ রায়চৌধুরী।

—আরে—আরে, একেবারে কার্বন কপি যে! কথাটা বলেই পরিতোষ জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে তোর বাবার নাম তো পরেশ—পরেশ রায়। তাই না? পরিতোষ এবারে তার ভাগ্নে বউয়ের দাবীদার জয়ন্তীর সঙ্গে 'তুমি' ছেড়ে তুই-তে নেমে এসেছে।

সামান্য মাথা তুলে কেবল ঘাড় নাড়ে জয়ন্তী। বলতে থাকে পরিতোষ, এখানেও যে দেখছি রাজযোটক। কদমতলার নরেশ রায়চৌধুরীর মেয়ে অবন্তী, আর নাকতলার পরেশ রায়ের মেয়ে জয়ন্তী।

—যা বলেছ। স্বামীর দিকে হেসে তাকায় বনানী।

আবার কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে পরিতোষ সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করে, জামাইবাবু কি কদমতলায় চিঠি লিখেছে?

জবাব দেয় সঞ্জয়, বাবার টেবিলের ওপর তো অনেকগুলো চিঠি দেখলাম। সবই বাবার লেখা।

ভ্রু-কুঁচকে একটু চিন্তা করে পরিতোষ। তারপর নিজের আসন ছেড়ে সঞ্জয়ের পাশে এসে বসে জয়ন্তী ও বনানীকেও ডেকে নেয় নিজের কাছে। অবশেষে নিচু কণ্ঠে বলতে থাকে, কৌশল—কৌশল ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই। জামাইবাবুর সঙ্গে সোজাসুজি লড়াই চালাতে গেলে গো-হারা হেরে যাবো। কাজেই একমাত্র পথ কৌশল।

—কি কৌশলের কথা বলছো তুমি? জিজ্ঞেস করে বনানী।

চাপা কণ্ঠে এবার পরিতোষ বলতে থাকে তার কৌশলের কথা। আর উপস্থিত সবাই তাদের কৌতূহলী চোখ মেলে পরিতোষের দিকে তা'কিয়ে থাকে।

একসময় পরিতোষ থামতেই বলে উঠে সঞ্জয়, সর্বনাশ, এ তুমি কি বলছো, ছোটমামা? এর ফলে কি কাণ্ড ঘটবে তা তুমি বুঝতে পারছো?

—চুপ কর, ভাগ্নেকে প্রায় ধমকে ওঠে পরিতোষ, সবকিছু ভেবেচিন্তে আঁট-ঘাঁট

না ভেবে এই শর্মা কোন কথা বলে না। যা বলছি কেবল চোখ বুজে তাই করবি। পরের দায়িত্ব আমার। কেবল কাল সকালে যে করে পারিস তোদের দু'জনের ঠিকুজির ছক্ আমায় এনে পৌছে দিবি। কথার শেষে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে পরিতোষ আবার জিজ্ঞেস করে, কিরে, তুই পারবি তো ?

এতক্ষণে মাথা তোলে জয়ন্তী। একটু সময় চুপ্ করে থেকে বললে, ওটা তো বাবার আলমারিতে থাকে। কোন রকমে—

জয়ন্তীর কথার মধ্যেই বলে ওঠে পরিতোষ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, কোন রকমে সবাইকে লুকিয়ে ঐ ছকের একটা কপি করে আমাকে দিয়ে যাবি। দেখিস, ছকের ঘর ও লেখাগুলো যেন আবার উল্টোপাল্টা না হয়ে যায়। আর তুই, বলেই পরিতোষ সঞ্জয়কে বললে, তোর ঠিকুজি তো তোর বাবার ড্রয়ারে থাকে বলেই জানি। ওখানেই তো জামাইবাবুর দরকারি কাগজপত্র থাকে। তুই ওখান থেকেই ম্যানেজ করবি। কিরে পারবি না ?

চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দেয় সঞ্জয়, একটু ভাবনার কথা ছোটমামা। তুমি তো বাবাকে চেন। বড়ই হুঁশিয়ার মানুষ। তাই ভাবছি –

—এতে আবার ভাবনার কি আছে ? বলে ওঠে পরিতোষ, দেখ্, সঞ্জু, তোকে নিজের ভাগ্নে বলে পরিচয় দিতেও আমার লজ্জা করছে। জয়ন্তী একটা মেয়ে হয়ে যে কাজ পারবে, তুই ছেলে হয়ে তা' পারবি না ? ছ্যা –ছ্যা !

সঞ্জয়ে হয়ে এবার বনানী বললে, এ আবার কি কথা বলছো তুমি ? জয়ন্তীর বাবা তো আমাদের জামাইবাবুর মত হুঁশিয়ার নাও হতে পারে !

—থামো তো ! স্ত্রীকে প্রায় ধমকে ওঠে পরিতোষ, কথায় বলে এ ধরনের ব্যাপারে ছেলেরা বাঘের দুধ পর্যন্ত নিজের হাতে দুইয়ে আনতে পারে। আর এ তো সামান্য একটা জন্ম ছকের কপি।

বরাত নেহাতই ভালো বলতে হবে সঞ্জয়ের। নইলে বন্ধ খামের মুখ খোলার মত ঝক্‌মারি কাজে তাকে হাত লাগাতে হতো। কিন্তু তার কিছুই করতে হলো না ! মজুমদার সাহেবের টেবিলের ওপর দশখানি খামের প্রত্যেকটির ভেতরই একখানা করে চিঠি। ন'খানা চিঠির বয়ান একই রকম—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার কন্যার ছকের সঙ্গে আমার পুত্রের ছক্ মেলে নি। কাজেই এ বিষয়ে আর অগ্রসর হতে আমি অনিচ্ছুক ইত্যাদি। কেবল সেই নরেশ রায়চৌধুরীর চিঠির বয়ানই অন্যরকম—আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার সর্বসুলক্ষণা কন্যার জন্ম-ছকের সঙ্গে আমার পুত্রের ছকের চমৎকার মিল হয়েছে। একেবারে একশোভাগ রাজযোটক। আপনি পত্রপাঠ আপনার কন্যার একখানি

ছবি-সহ আমার সঙ্গে এসে দেখা করুন।

মজুমদার সাহেব বোধহয় ভেবেছিলেন, পরের দিন সকালে খামের মুখ বন্ধ করে স্ট্যাম্প লাগিয়ে তিনি চিঠিগুলো ডাকে দেবেন। কিন্তু তার আগেই পরিতোষের সেই কৌশলে সঞ্জয়ের মাধ্যমে ঘটে গেল ভোজবাজি। অবন্তীর বাবা নরেশ রায়চৌধুরী চলে গেলেন ন'জনের দলে, আর জয়ন্তীর বাবা পরেশ রায়ের কাছে গেল সেই আমন্ত্রণ লিপি। সঞ্জয়ের কপাল সত্যিই সেদিন ভালো বলতে হবে। মজুমদার সাহেবের ড্রয়ারের চাবি খুঁজে ড্রয়ার থেকে নিজের ঠিকুজি বের করে জন্ম ছকের কপি করতেও তেমন বেগ পেতে হলো না তাকে। অবশেষে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই সঞ্জয় বেরিয়ে এলো তার বাবার বাইরের ঘর থেকে সবার অলক্ষ্যে। এমনকি তার ছোটমামার নির্দেশমত চার্টের ন'টি মেয়ের নামের পাশে লাল কালি দিয়ে লেখা ক্রশ্ চিহ্নগুলোও বাকিটির মত তারকা চিহ্নিত হয়ে সব একাকার হয়ে গেল।

ছয়

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই গাছের নিচে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ চলছে সঞ্জয় ও জয়ন্তীর। পরিতোষের সেই কৌশলের প্রয়োগে তারা উভয়েই খানিকটা নিশ্চিন্ত। তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছেনা তারা। সঞ্জয়ের ভয় তার বাবা মজুমদার সাহেবকে। তিনি যদি কোন রকমে কিছু টের পান তা'হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বেন। এমনকি সঞ্জয়কে ত্যাজ্যপুত্র করেও ছাড়তে পারেন। একমাত্র পুত্র বলেও রেয়াত করবেন না। এখন একমাত্র ভরসা তার ছোটমামা। অন্যদিকে জয়ন্তীর চিন্তাও তার বাবাকে নিয়ে। নরেশের বদলে পরেশ যখন গিয়ে উপস্থিত হবেন তখন যদি একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তিনি নাস্তানাবুদ হন তা হ ল আর দুঃখের শেষ থাকবে না জয়ন্তীর। দয়িতের সঙ্গে মিলনের আশায় কোন্ মেয়ে তার বাবার বিপদ ডেকে আনতে চায়?

খোলা ভেঙ্গে বাদাম চিবোতে চিবোতে জয়ন্তী সঞ্জয়কে কথাটা বলতেই সে জবাব দেয়, তোমার বাবার আর ভয় কি? তিনি তো আমার বাবার আমন্ত্রণ পেয়েই সেখানে যাবেন। ভয় তো আমার। টের পেলে আর রক্ষে নেই। ছোটমামার দোহাই দিয়েও তখন পার পাবো না। কি যে ঐ রাজযোটকের রোগ বাবার!

মনে মনে হিসেব করে জয়ন্তী আবার বললে, চারদিন হলো তোমার বাবা সেই চিঠি ছেড়েছেন। আজও কিন্তু তা' আমার বাবার কাছে পৌঁছলো না। মানিকতলা থেকে নাকতলা। এটুকু রাস্তা পেরোতে এত সময় লাগে?

সঞ্জয় জয়ন্তীর কথার জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে বললে, আমি ভাবছি অন্যকথা। দেশের পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের যে হাল তাতে যদি পথের মধ্যেই চিঠি লোপাট হয়ে যায়?

চোখে-মুখে শঙ্কার ভাব জেগে ওঠে জয়ন্তীর। বললে, সত্যিই তো। তেমন হলে যে তোমার ছোটমামার গোটা প্ল্যানটাই মাঠে মারা পড়বে।

—সেই সঙ্গে আমরাও। তেমনি হেসেই বললে সঞ্জয়।

এমন একটা সিরিয়াস বিষয়ে সঞ্জয়ের ঐ হাল্কা হাসি তেমন ভালো লাগছিল না জয়ন্তীর। তাই সে অখুশি কণ্ঠে বললে, তাতে তোমার আর লোকসান কি? সেক্ষেত্রে তোমার বাবা হয়তো কেঁচে গণ্ডুষ করে সেই অবন্তীকেই নিয়ে আসবেন।

—তোমার বাবাও হয়তো সঞ্জয়ের বদলে তখন কোন ধনঞ্জয়কে খুঁজতে বেরোবেন। কথার শেষে সঞ্জয় একটু জোরে হেসে উঠতেই জয়ন্তী কৃত্রিম অভিমান ভরে হাতের বাদামের ঠোঙাটা সঞ্জয়ের কোলের ওপর ঝপ্ করে ফেলে দিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

সেই মুহূর্তে জয়ন্তীর অভিমানী মুখখানা বড়ই ভালো লাগে সঞ্জয়ের। তার অভিমানকে আরও একটু উস্কে দিতে আড়চোখে একবার জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে মনে মনে হেসে সঞ্জয় বললে, ধনঞ্জয়ের নামেই যে দেখছি গোটা বাদামের ঠোঙাটাই উপহার! আসল লোকটিকে ধরে এনে দিতে পারলে—

কথাটা শেষ করতে পারে না সঞ্জয়। চোখের পলকে জয়ন্তী নিজের সামনে স্তূপাকৃতি বাদামের খোলা থেকে একমুঠো খোলা তুলে নিয়ে সঞ্জয়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠে, এইগুলো। কথাটা শেষ করেই খিল্ খিল্ শব্দে হেসে ওঠে জয়ন্তী। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ও। হালকা পরিহাসের মধ্যে জয়ন্তীর সেই কৃত্রিম অভিমান কোথায় উবে যায়।

একসময় হাসি থামিয়ে সঞ্জয়ের দিকে একটু চেপে বসে জয়ন্তী বেশ সিরিয়াস কণ্ঠে বললে, সত্যি, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। ছোটমামা যে খেলা শুরু করেছেন শেষে যদি সামলাতে না পারেন?

এই আশঙ্কা সঞ্জয়ের নিজেরও। তবুও জয়ন্তীকে সাহস দিতে গিয়ে হাল্কা সুরে সে জবাব দেয়, তুমি তো আমার ছোটমামাকে চেন না। ছোটমামার শরীরের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। খেলতে যখন নেমেছে তখন হারবার পাত্র সে মোটেই নয়।

জয়ন্তী আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, ছোটমামা আমার ও তোমার জন্মছক

নিয়ে কি করতে চান ?

—ব্যাপারটা আমার কাছেও তেমন স্পষ্ট নয়। তুমি তো আগের দিন গিয়ে তোমার ছক্‌টা তাকে দিয়ে এলে। আমি পরের দিন আমার ছক্‌ দিতে গিয়ে ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করতেই ছোটমামা কেবল রহস্যময় স্বরে বলেছিল, 'দাবাব চাল।'

—তার মানে ? কৌতূহলী প্রশ্ন জয়ন্তীর।

জবাব দেয় সঞ্জয়, মানে কি ছাই আমিই জানি ? ছোটমামীকে জিজ্ঞেস করতে সে জবাব দিয়েছিল, তোমার ছোটমামার কোন একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। নইলে কি আর শুধু শুধু তোমাদের দুজনের জন্মছক্‌ চেয়ে নিয়েছে ? ব্যস্‌, এই পর্যন্ত। ছোটমামীও আর এর বেশি কিছু ভাঙ্‌লে না।

শ্যামপুকুর অঞ্চলের গলির গলি, তস্য গলিব শেষ প্রান্তে একটা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় পরিতোষ। দরজার সামনে একদিকে ঝুলেপড়া অন্তিম দশাগ্রস্ত একখানা সাইন বোর্ডের লেখার প্রায় সবটাই উঠে গেছে। ভেতরে একখানা পুরানো নড়বড়ে চৌকির ওপর ততোধিক নড়বড়ে এক বৃদ্ধ চোখের চশমা নাকের ডগায় ঝুলিয়ে খবরের কাগজের খুদে অক্ষরগুলোর দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন।

পরিতোষের পায়ের শব্দে সেই বৃদ্ধ মুখ তুলে তাকিয়ে গডগড কবে বলে ওঠেন, দু'কদম এগিয়ে বাঁ-হাতের গলি।

—তার মানে ? পরিতোষ অবাক্‌ চোখে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধেব দিকে।

—পরিতোষকে তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বৃদ্ধ এবার স্পষ্ট অখুশি কণ্ঠে বললেন, বললাম তো, দু'কদম এগিয়ে বাঁ-হাতের গলি।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে এখনও কিছু জিজ্ঞেসই করিনি।

—এ্যাঁ, তাই নাকি ? বৃদ্ধ এবার একটু নডেচডে বসেন, আপনি ঘোষ ডাক্তারের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না ?

—না তো। জবাব দেয় পরিতোষ, আমি এসেছি রাখহরি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

—তাই নাকি ? এবার কোক্‌লা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধের। তাড়াতাড়ি জবাব দেন, আমি—আমিই রাখহরি চক্রবর্ত্তী। বলুন, আপনার কি দরকার ?

খুব একটা দোষ দেয়া চলে না জ্যোতিষী রাখহরি চক্রবর্ত্তীকে। খদ্দেরের অভাবে এই নড়বড়ে চৌকির ওপর খবরের কাগজখানা নিয়েই তাঁর সময় কাটে। নামী ডাক্তার বি. কে. ঘোষের বাড়িটা ঠিক্‌ তাঁর বাড়ির পেছনেই। এখানে বসে বসে রোগীদের ডক্টর ঘোষের বাড়ির পথ বাত্‌লে দেয়াই ইদানীং তাঁর একমাত্র কাজ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই সেই একই জবাব—দু'কদম এগিয়ে বাঁ-হাতের গলি।

চশমার ফাঁকে সঞ্জয় ও জয়ন্তীর জন্ম-ছকের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে রাখহরি বললেন, যোটক বিচার তো?

—আজ্ঞে না। জবাব দেয় পরিতোষ।

—তবে?

—আজ্ঞে ছক্ তৈরি।

—কার?

—একটি মেয়ের।

—জন্ম সময়টা বলুন।

—আজ্ঞে, ওটা আপনাকেই বলে দিতে হবে।

—তার মানে? ঠাট্টা করছেন নাকি? চটে ওঠেন রাখহরি।

বৃদ্ধকে শান্ত করতে চেষ্টা করে পরিতোষ তাড়াতাড়ি জিভ কেটে জবাব দেয়, না—না, পণ্ডিতমশাই। ঠাট্টা করার জন্যে কি এতদূরে ছুটে এসেছি? তারপর একটু থেমে আবার বলতে থাকে, শুনুন পণ্ডিতমশাই, ঐ যে দেখছেন ছেলেটির জন্ম-ছক্, ঐ ছকের সঙ্গে নাকি মেয়েটির এই ছক্ মিলছে না।

ছক্ দুটোর ওপর চোখ রেখে রাখহরি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তা-ই হবে হয়তো। ভাল করে বিচার করতে হবে।

পরিতোষ আবার বললে, ছেলেটির ঐ ছকের সঙ্গে সঙ্গতি-রেখে মেয়েটির ঐ ছকে পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন একটা নতুন জন্ম-ছক্ তৈরি করে দিতে হবে যাতে যে কোন জ্যোতিষী বলতে বাধ্য হবে ওদের মধ্যে রাজযোটকের মিল। এজন্যে মেয়েটির জন্ম-সময় নির্ধারণ করার দায়িত্ব আপনার।

পরিতোষের কথায় কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন রাখহরি। তাঁর এতকালের জ্যোতিষী-জীবনে এমন অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে এর আগে আর কেউ তাঁর কাছে আসেনি।

রাখহরিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরিতোষ আবার বললে, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না পণ্ডিতমশাই। আপনার পারিশ্রমিক আপনি পাবেন।

নাকের ডগায় ঝোলানো চশমার কাঁচের বদলে ওপরের ফাঁকা জায়গা দিয়ে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে রাখহরি বললেন, তার মানে, দুই নম্বরী কাজ? দিনে-দুপুরে রাহাজানি, কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে জবাব দেয় পরিতোষ, না, ডাকাতি।

—কি বললেন?

—আজ্ঞে না, কিছু না। বলছিলাম, দু'নম্বরী কাজের দক্ষিণা যে কিছু

বেশিই হয় তা' আমি জানি।

—বেশ, তা'হলে একটু বসুন। কথাটা বলেই রাখহরি তাঁর পুরানো পুঁথিপত্র, পঞ্জিকা ইত্যাদি নিয়ে জয়ন্তীর জন্ম-সময়টাকে পাল্টে দিয়ে তার নতুন জন্ম-ছক্ তৈরি করতে লেগে পড়েন।

বাড়ি ফিরে এসে পরিতোষ জয়ন্তীর নতুন জন্ম ছক্‌টা দেখিয়ে স্ত্রী বনানীকে বললে, ব্যাস্, আপাততঃ কাজ শেষ। এবাব থেকে এই নতুন ছক্‌টাই হবে জয়ন্তীর আসল জন্মছক্।

—এটা কি এখন জামাইবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেবে? জিজ্ঞেস করে বনানী।

জবাব দেয় পরিতোষ, তুমি ক্ষেপেছ? এটা করে রাখলাম ভবিষ্যতের জন্যে। জামাইবাবুকে তো চিনি। তিনি সহজ পাত্র নন। জয়ন্তীর ছক্ নিয়ে একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলে জয়ন্তীর বাবাকে বিপাকে ফেলতে পারেন তিনি। জয়ন্তীকে দিয়ে ওর আসল ঠিকুজি সরিয়ে ফেলে সেখানে এই নতুন ছক্‌টা রেখে দিতে হবে যাতে ওর বাবা দরকার হলে এটা নিয়েই আবার হাজির হতে পারেন জামাইবাবুর কাছে।

মজুমদার সাহেবের চিঠি পেয়ে জয়ন্তীর বাবা পরেশ রায় আনন্দে আত্মহারা। স্ত্রী প্রতিমার হাতে চিঠিখানা তুলে দিয়ে হেসে বললেন, দেখ—দেখ, ভদ্রলোক কি লিখেছেন, দেখ। তোমার সর্বসুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে নাকি একেবারে রাজযোটক। ভদ্রলোকের লেখার ঢংটাই বলে দিচ্ছে ছবি দেখে পছন্দ হলে তাঁরা বোধহয় রাজি হবেন। এখন সবই মঙ্গলময়ীর ইচ্ছে। কথার শেষে পরেশ রায় সেই মঙ্গলময়ীর উদ্দেশে হাতজোড় করে নমস্কার করেন। স্বামীর দেখাদেখি তাঁর মুখোমুখি সোফায় বসে প্রতিমাও তেমনি ভঙ্গিতে নমস্কার করেন সেই মঙ্গলময়ীকে। ঘরে ঢুকতে এসে বাবা-মাকে মুখোমুখি বসে পরস্পরকে হাতজোড় করে নমস্কার করতে দেখে বিস্মিত জয়ন্তী লজ্জায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে যায়।

একটু পরে জয়ন্তী আবার ঘরে ঢুকতেই প্রতিমা মেয়েকে বললেন, তোর এ্যাল্‌বাম থেকে একখানা ভালো ছবি বেছে নিয়ে আয় তো মা। কাল ঐ ছবি নিয়ে তোর বাবা মানিকতলায় এক পাত্রের বাড়ি যাবেন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আশা-আশঙ্কার এক বিচিত্র দোলায় মনটা দুলে ওঠে জয়ন্তীর। তা'হলে শেষ পর্যন্ত চিঠি এলো। এখন শেষরক্ষা হলেই বাঁচোয়া।

কলিংবেল বেজে উঠতেই স্বয়ং মজুমদার সাহেব দরজা খুলে এসে দাঁড়াতেই

পরেশ রায় হাতজোড করে নমস্কার করে বললেন, আপনার চিঠি পেয়েই পাত্রীর ছবি নিয়ে এসেছি। আমি পাত্রীর বাবা।

—আসুন—আসুন। অতি সমাদরে পরেশ রায়কে নিয়ে এসে সোফায় বসান মজুমদার সাহেব। তারপর নিজে একপাশে বসে জিজ্ঞেস কবেন, বাড়ি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় নি তো?

—না—না, হেসে জবাব দেন পবেশ বায়, আপনাদের ঐ গলির মুখেব পাশের দোকানে জিজ্ঞেস কবতেই বলে দিলে।

পরেশ বায়েব জবাবে মজুমদাব সাহেবের মুখে ফুটে ওঠে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি। বেশ একটু গর্বভরেই বললেন তিনি, পানওয়ালা থেকে ঠেলাওয়ালা পর্যন্ত এ তল্লাটেব প্রত্যেকেই আমাকে চেনে। মজুমদার বাড়ি বললে বাড়ির নম্বর না হলেও সবাই দেখিয়ে দেবে। কথার শেষে আবাব একটু হাসেন তিনি। মজুমদার বাড়ি না বলে হয়তো মজুমদার সাহেবেব বাড়ি বলারই তাঁর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নিজের কথা এভাবে বলাটা শোভন নয় মনে করেই তিনি তা' বললেন না।

ঠিক্ এমনি সময় স্ত্রী সাবিত্রী দরজার কাছে এসে দাঁডাতেই মজুমদার সাহেব বললেন, এসো—ভেতবে এসো। আমাব চিঠি পেয়ে পাত্রীর ছবি নিয়ে এসেছেন নবেশবাবু।

পবেশের বদলে নরেশ। কথাটা পবেশ রায়ের কানে গেলেও তিনি এটাকে মজুমদার সাহেবের ভুল মনে কবে তাঁকে সংশোধন কবতে চেষ্টা না কবে উঠে দাঁডিয়ে সাবিত্রীকে নমস্কার করে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আমি। আপনাদের চিঠি পেয়ে মেয়ের ছবি নিয়ে এসেছি। আমার মেয়ের ঠিকুজির সঙ্গে আপনাদের ছেলের নাকি বাজযোটক মিল হয়েছে।

—হ্যাটস্ রাইট, বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, বিয়ে-শাদিব ব্যাপারে ওটাই আমার প্রথম সর্ত। বাজযোটক মিল হয়েছে বলেই আপনাকে আসতে লিখেছি। এখন, আপনার মেয়ের ছবি দেখে পছন্দ হলেই কথাবার্তা বলবো।

পরেশ রায় তাঁর পকেট থেকে জয়ন্তীর ছবির খামখানা বের কবে সাবিত্রীব হাতে দিতে দিতে বিগলিত ভঙ্গিতে বললেন, দেখুন, সবই প্রজাপতিব নির্বন্ধ। মেয়ের বাপ বলে বলছি না, তবে আমার মেয়ে বাস্তবিকই সুন্দরী।

খাম থেকে ছবিখানা টেনে তুলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন সাবিত্রী। দেখতে দেখতে তাঁর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে খুশির ভাব। সত্যি, বাড়িয়ে বলেননি পাত্রীর বাবা। বাস্তবিকই সুন্দরী মেয়েটি। যেমনি চেহারা, তেমনি মুখের গড়ন। একটা শান্ত-শ্রী যেন ঘিরে রেখেছে মেয়েটিকে—একটি সদ্য ফোটা

গোলাপ ফুল যেন, যার গায়ে তখনও লেগে রয়েছে ছোট ছোট শিশির বিন্দু।

প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে পছন্দ হয়ে যায় সাবিত্রীর। কিন্তু সেকথা সেই পরিস্থিতিতে মুখ ফুটে বলে ফেলা চলে না। তাই ছবিখানা মজুমদার সাহেবের হাতে তুলে দিতে দিতে সাবিত্রা পরেশ রায়কে বললেন, মেয়ে আপনার দেখতে তো ভালোই। তবে ব্যাপার কি জানেন, সব সময় ছবির সঙ্গে আসলের ঠিক্ মেলে না। তাই—

সাবিত্রীর কথার মধ্যেই বলে ওঠেন পরেশ রায়, না-না, আমার মেয়ের বেলায় তা' মোটেই ঠিক্ নয়। ছবিতে যা দেখছেন, মেয়ের চেহারাটা ঠিক্ তাই। একচুল এদিক-ওদিক নয়।

—একালের কালার্ড ছবিতে 'গায়ের রং ঠিক্ বোঝা যায় না। সাবিত্রী আবার বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন পরেশ রায়, গায়ের রং খুবই ফর্সা। চাক্ষুস দেখেই বুঝতে পারবেন।

একটু থেমে পরেশ রায় আবার বললেন, এই—এই দেখুন আমাকে। আমাকে তো সবাই ফর্সা বলে। আমারই তো মেয়ে। মেয়ের মা মানে আমার স্ত্রীর গায়ের রং আমার চাইতেও ফর্সা। কাজেই বুঝতে পারছেন মেয়ের গায়ের রং কেমন হবে।

পরেশ রায়ের কথায় মনে মনে পুলকিত বোধ করেন সাবিত্রী। পাত্রী সুন্দরী, গায়ের রং ফর্সা, ঠিকুজি বিচারে রাজযোটক। ভদ্রলোক পোষাক, চেহারা ও কথাবার্তায় বেশ ভদ্র। এঁর মেয়ে কিছুতেই খারাপ হতে পারে না। কাজেই অন্য কিছুতে না আট্‌কালে এই মেয়েকেই নিজের পুত্রবধু করে ঘরে আনতে মনে মনে প্রায় প্রস্তুত হয়ে ওঠেন সাবিত্রী।

পাত্রীর ছবিটা মজুমদার সাহেবেরও ভাল লেগেছিল। ছবির ওপর চোখ রেখেই তিনি জিজ্ঞেস করেন পরেশ রায়কে, আচ্ছা নরেশবাবু, আপনার কন্যা এম্-এ পাশ করার পরে এখন কী করছে?

—এম্-এ পাশ! একেবারে আকাশ থেকে পড়েন পরেশ রায়। তার ওপর পরেশের বদলে বারে বারেই কেবল নরেশ।

মজুমদার সাহেবের ভুল ভাঙাতে গিয়ে পরেশ রায় এবার বললেন, মাফ করবেন। আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে। আমার মেয়ে তো এম্-এ পাশ নয়। সে তো ফিলজফি অনার্স নিয়ে যাদবপুরে বি. এ. পড়ছে। তা'ছাড়া—

পরেশ রায়ের কথার মধ্যেই ভ্রু-কুঁচকে বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, সেকি, আপনি তো জানিয়েছেন আপনার কন্যা নাকি এম্-এ পাশ।

মনে করি সংসারে মেয়েদের এটাই প্রধান গুণ।

—যা বলেছেন, বলতে থাকেন পরেশ রায়, আপনারা মেয়েরা হচ্ছেন অন্নপূর্ণা। আপনারা আমাদের ভালো-মন্দ খাওয়ান বলেই তো আমরা খেয়ে বেঁচে আছি। নইলে বাড়ির সঙ্গে হোটেলের তো কোন তফাৎই থাকতো না।

পরেশের কথায় সাবিত্রী একটু সলজ্জ হাসেন। তারপর বললেন, না—না, তাই বলে মনে করবেন না যে আমার ঘরে এসে আপনার মেয়েকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে। আমার এখানে দু'দুটো রান্নার লোক, কাজের লোক আছে। তা'ছাড়া আপনার মেয়ে আমার কাছে থাকবেই বা কটা দিন? সঞ্জু যেখানে থাকবে সেখানেই তো থাকতে হবে ওকে।

পরেশ ও সাবিত্রী যখন কথা বলছিলেন তখন মজুমদার সাহেব চুপ্‌ করে বসে বসে কি যেন চিন্তা করছিলেন। স্ত্রীর শেষের কথাটা কানে যেতেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি। সাবিত্রী এমনভাবে বলছে যেন এই মেয়েকেই সে ঘরে আনবে। কিন্তু সমস্যাটার তো এখনও নিষ্পত্তি হলো না। সত্যিই কি এই মেয়ের সঙ্গে রাজযোটকের কথাই পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন?

মজুমদার সাহেব একটু শুক্‌নো হেসে পরেশকে বললেন, শুনুন রায়মশাই, আপনার মেয়েকে আমরা অবশ্যই দেখতে যাবো। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

মজুমদার সাহেবের কথায় পরেশ ও সাবিত্রী একযোগে তাকান তাঁর মুখের দিকে।

বললেন মজুমদার সাহেব, আপনি আপনার মেয়ের জন্ম-ছক্‌টা আর একবার আমাকে দিতে পারেন?

—আবার কেন? অখুশি কণ্ঠস্বর সাবিত্রীর, আবার তুমি ছক মেলাতে চাও নাকি?

মুখে কিছু না বলে চোখে স্ত্রীকে ধমক্ দেন মজুমদার সাহেব। তারপর পরেশের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, একবার যখন রাজযোটক হয়েছে তখন আবারও হবে। তবুও—বুঝতেই তো পারছেন রায়মশাই, একটা মেণ্টাল সেটিস্‌ফেক্‌শন।

—ঠিক্ আছে—ঠিক্ আছে। তাড়াতাড়ি জবাব দেন পরেশ, আগের ছক্‌টা কি আপনার কাছে নেই?

মজুমদার সাহেব জবাবে বললেন, ওটা তো পণ্ডিতমশাইকে দিয়েছিলাম। বিচারের পরে ওটা কি আর তিনি রেখে দিয়েছেন? ফেলে দিয়েছেন নির্ঘাৎ। তাই বলছিলাম—

—এতে আর অসুবিধে কিসের? বলে ওঠেন পরেশ, আমি কালই ওটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। এবার বলুন, আপনারা কবে আমার মেয়েকে দেখতে যাচ্ছেন?

একটি মনের মত পাত্রী পাওয়ার আনন্দে স্বামীর চোখের ধমকের কথা ভুলে গিয়ে সাবিত্রী আবার বললেন, এখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? পাত্রীর ছবি তো দেখলাম। এখন যে কোন দিন—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, মজুমদার সাহেবের কণ্ঠেও এবার উৎসাহের স্বর, ছক্‌টা আর একবার যাচাই করে তারপর যে কোন দিন গেলেই চলবে।

পুরোপুরি খুশি হতে না পারলেও মোটামুটি খুশি মনেই মজুমদার সাহেবের বাড়ি থেকে চা-জলখাবার খেয়ে বাড়ি ফিরলেন পরেশ রায়। ঘরে ঢুকতেই স্ত্রী প্রতিমা এগিয়ে এসে উৎকণ্ঠির স্বরে জিজ্ঞেস করেন, কি বললে ওরা? জতুর ছবি দেখে ওদের পছন্দ হয়েছে?

গায়ের জামা খুলতে খুলতে হেসে জবাব দেন পরেশ, পাত্রপক্ষ বলে কথা। সঙ্গে সঙ্গে কি মুখ ফুটে পছন্দ অপছন্দের কথা বলে? তবে হাবভাবে বুঝলাম জতুকে খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের। তবে, জন্ম-ছক্‌টা আর একবার পাঠাতে হবে।

—তার মানে? কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন প্রতিমা, চিঠিতে তো লিখেছে রাজযোটক হয়েছে। তা'হলে আবার জন্ম-ছক্ কেন?

—আর বল কেন? হাসতে হাসতে বললেন পরেশ, কোথাকার এক নবেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন পাত্রর বাবা। ভদ্রলোক একটু একরোখা প্রকৃতির বলে মনে হলো। কোষ্ঠি ঠিকুজির ওপর ভদ্রলোকের প্রচণ্ড ঝোঁক। পাত্রর ছক্ নরেশের মেয়ে অবন্তী, নাকি পরেশের মেয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে মিলেছে, সেই ব্যাপারে সন্দেহ হওয়াতেই জতুর ছক্‌টা আর একবার যাচাই করতে চাইছেন।

—তা'হলে তোমাকে চিঠি দিলে কেন?

—ওখানেই তো গোলমাল। ওঁর ধারণা উনি নিজেই কোনরকম ভুল করে থাকতে পারেন।

একটু থেমে পরেশ আবার বললেন, ও নিয়ে চিন্তা করো না। একবার যদি মিলে থাকে তা'হলে আর একবারও মিলবে।

জয়ন্তীর ঠিকুজি থেকে ছক্‌টা লিখে নিতে গিয়ে ঠিকুজিখানা আর খুঁজে পান না পরেশ। টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে হাতড়ে হয়রাণ হয়ে গেলেন তিনি। ড্রয়ারে হাত দেয় বলে চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে টুকি বাপের কাছে ধমক খেল। শেষে পরেশের মনে পড়লো ঠিকুজিখানা তিনি স্ত্রী প্রতিমার হাতে দিয়েছিলেন।

জোর গলায় মজুমদার সাহেবের কথায় পরেশ রায়ও দৃঢ়তার সুরে বললেন, ;তেই পারে না। আমার মেয়ের কোয়ালিফিকেশন আমি বাড়িয়ে লিখতে াবো কেন? তা'ছাড়া, আপনি আরও একটা ভুল করছেন। আমার নাম রেশ নয়, পরেশ—পরেশ রায়।

—পরেশ রায়? নরেশ রায়চৌধুরী নয়? মজুমদার সাহেবের চোখে বিস্ময়ের ঘোর, কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

মজুমদার সাহেবের কথা বলার ভঙ্গিতে মনে মনে বিরক্ত পরেশ রায় পাত্রীর াবা হয়েও নিজেকে পুরোপুরি শান্ত রাখতে না পেরে একটু জোরের সঙ্গেই জবাব দেন, আমার নাম পরেশ রায়। আমি কেন নরেশ রায়চৌধুরী হতে যাবো? চৌধুরী আমরা কোনকালেই নই।

এবার জেরা করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন মজুমদার সাহেব, আপনি তো থাকেন কদমতলায়। হাওড়ার কদমতলা, কেমন?

—কদমতলায় আমি জীবনে কখনও যাই-ই নি। আমার বাড়ি নাকতলায়।

—নাকতলা? যাদবপুরের কাছে নাকতলা?

—অবশ্যই, কাছেপিঠে নাকতলা তো ঐ একটাই।

—তা'হলে বলছেন, আপনার মেয়ে অবন্তী এম্-এ পাশ নয়?

বিব্রত পরেশ রায় এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেন, পাত্রীর নাম অবন্তী হতে যাবে কেন? ওর নাম তো জয়ন্তী।

মজুমদার সাহেব এতক্ষণে বুঝতে পারেন কোথাও একটা বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিজের ড্রয়ার হাতড়ে পাত্রীর লিস্টের লম্বা কাগজটা বের করে চোখ বুলোতে গিয়েই কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চুপ করে থাকেন। সেই দশটি পাত্রীর প্রত্যেকটির নামের পাশেই লাল কালির তারকা চিহ্ন। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে আছে কেবল ঐ অবন্তীর নামের পাশেই তিনি তারকা চিহ্ন দিয়েছিলেন। বাকিগুলোতে দিয়েছিলেন ক্রস্ চিহ্ন। তবে কি তিনি নিজেই অন্যমনস্ক হয়ে ক্রস্ চিহ্নের বদলে সবগুলোই তারকা চিহ্ন করে রেখেছিলেন? এই তো—এই তো রয়েছে অবন্তী রায়চৌধুরীর নাম। বাবার নাম নরেশ রায়চৌধুরী। বাড়ি কদমতলায়। তারই কয়েকটা নামের পরে রয়েছে জয়ন্তী রায়ের নাম। বাবার নাম পরেশ রায়। বাড়ি নাকতলায়।

লিস্টের কাগজখানা হাতে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে আরও কিছুক্ষণ লিস্টের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন মজুমদার সাহেব, তা'হলে কি সেদিন পণ্ডিতমশাই তাঁকে ভুল বলেছিলেন, নাকি তিনি নিজেই ভুল শুনেছিলেন? তিনি তো সেদিন লিখিত কিছু দেন নি। কেবল মুখেই বলেছিলেন। আর তাই

শুনে তিনি লিস্টে তারকা চিহ্ন দিয়েছিলেন। এমনও তো হতে পারে যে পণ্ডিতমশাই পরেশের মেয়ে জয়ন্তীর কথাই বলেছিলেন কিন্তু তিনি নিজে নরেশের মেয়ে অবন্তীর নামের পাশেই ভুলে তারকা চিহ্নটি দিয়ে বসেছিলেন। সম্ভবতঃ এটাই ঠিক। জয়ন্তীর ছবিখানা দেখার পরে মজুমদার সাহেবের কেন যেন মনে হতে লাগলো যে ভুল করেছিলেন তিনি নিজেই। পরেশ রায়ের মেয়ে জয়ন্তীর কথাই সেদিন বলে গিয়েছিলেন পণ্ডিতমশাই। রাজযোটক মিল হয়েছিল এই জয়ন্তীর সঙ্গেই।

মনের খটকা কিন্তু তবুও দূর হয় না মজুমদার সাহেবের। যদি এই মেয়েটির সঙ্গে রাজযোটক মিল না হয়ে থাকে তা হলে তো সর্বনাশ! তা ছাড়া চিঠিতেও তো কোন রকম গোলমাল হতে পারে।

পরেশের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করেন মজুমদার সাহেব, তা'হলে আপনাকেই আমি আসতে লিখেছি, কেমন?

—আলবৎ। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে নিজের পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে পরেশ রায় বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, এই যে, এই দেখুন আপনার চিঠি।

চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কি যেন বলতে যান মজুমদার সাহেব। কিন্তু তার আগেই সাবিত্রী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমারও যেন এখন মনে হচ্ছে তুমি পরেশবাবুর মেয়ে জয়ন্তীর কথাই আমাকে বলেছিলে। চিঠিও সেই মতই লিখেছিলে। মাঝখান থেকে এই লিস্টিতে দাগ দেয়া নিয়েই যত গোলমাল।

কথার শেষে সাবিত্রী হাসি হাসি মুখে পরেশকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার মেয়ে ঘরের কাজকর্ম একটু একটু জানে তো?

—অবশ্যই, জবাব দেন পরেশ, বাঙ্গালী ঘরের কোন্ মেয়ে ঘরের কাজ একটু-আধটু জানে না বলুন? এমনকি মোটামুটি রান্নাবান্নাও করতে পারে।

—তাই নাকি? আনন্দে আত্মহারা সাবিত্রী মজুমদার সাহেবকে লক্ষ্য করে আবার বললেন, শুনলে তো, মেয়ে রান্নাবান্নাও জানে। একালের মেয়ের কিন্তু এই কাজটা ঠিক্ পছন্দ করে না। তাদের কথা, পয়সা ফেল, দোকান থেকে খাবার কিনে আনো।

পরেশ জবাব দেন, না—না, রান্নাবান্নায় খুব উৎসাহী আমার মেয়ে। নেহাৎ গায়ের রং পুড়ে যাবে বলে মেয়ের মা মেয়েকে রান্নাঘরে যেতে দেয় না। তবুও মাঝে-মধ্যে এমন দু'-একখানা রান্না করে ফেলে যে তার স্বাদ পরের দিনও জিভে লেগে থাকে।

—খুবই ভালো কথা, হেসে বললেন সাবিত্রী, যে যাই বলুক আমি কিন্তু

—থাক্—থাক্, বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, জয়ন্তী, অবন্তী, পরেশেই আপনার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার নরেশ এসে পড়লে খুবই বিপাকে পড়বেন।

একটু থেমে মজুমদার সাহেব পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে সঞ্জয় ও জয়ন্তীর দু'নম্বরী ছক দু'টো দিয়ে বললেন, ওসব পরেশ, নরেশ থাক। আমার ছেলে সঞ্জয় ও সেই পাত্রী জয়ন্তীর ছক এ দুটো। ভালো মত বিচার করে দেখুন। এদের রাজযোটক মিল হচ্ছে কিনা।

এতক্ষণে হাসি ফোটে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে। নিজের প্রসংশা নিজেই করতে গিয়ে বললেন, যাই বলুন, যোটক বিচারে কিন্তু আমার এখনও কোন ভুল হয় না।

—তা' জানি বলেই তো এ দু'টো আবার আপনাকেই দিলাম। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান মজুমদার সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাইও।

দু'টো দিনের মধ্যেই যোটক বিচারের ফল এসে যায় মজুমদার সাহেবের হাতে। এমন চমৎকার মিল নাকি সচরাচর দেখা যায় না। পাত্রীর ছবি দেখে মজুমদার সাহেব ও সাবিত্রীর খুবই পছন্দ। এবার মেয়েটিকে একবার চাক্ষুস দেখতে হবে। সাবিত্রী তো হেসে স্বামীকে বলেই ফেললেন, আমি কিন্তু ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এটিই আমার ঘরে আসছে। আহা, কেমন লক্ষ্মীশ্রী! কি মিষ্টি চেহারা! সঞ্জুর সঙ্গে দারুণ মানাবে।

স্ত্রীকে থামিয়ে বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, এখনই এত উচ্ছ্বসিত হয়ো না। কথায় বলে লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। মেয়েটিকে আগে দেখ। সঞ্জু রাজি হলে ওকেও একবার দেখাও। আজকালকার ছেলে। মা—বাবার পছন্দে কি আর ওদের পছন্দ হয়? সঞ্জুর দিল্লী যাবার তো আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। এর মধ্যেই দেখাদেখির পাট সেরে ফেলতে চাই। বাকি কথাবার্তা না হয় পরেই হবে।

সঞ্জয় ও জয়ন্তী একসঙ্গেই এলো পরিতোষকে সুখবরটা দিতে। পরিতোষ বনানীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, দেখলে তো এবার এই শর্মার বুদ্ধিখানা? এক চালেই জামাইবাবু কাত। জামাইবাবুর ইচ্ছেমত কেবল রাজযোটক নয়, একেবারে মহারাজযোটক। থ্রি চিয়ার্স ফর পরিতোষ—হিপ্ হিপ্ হুররে!

পরিতোষের কথায় সবাই হেসে ওঠে। বনানী স্বামীর দিকে একটা কটাক্ষ করে বললে, নিজের ঢাক যে দেখছি নিজেই বাজাচ্ছো।

জবাব দেয় পরিতোষ, বাজাতে হলে নিজের ঢাক নিজেকেই বাজাতে হয়। অন্যকে বাজাতে দিলে বেতালে বাজার সম্ভাবনা থাকে, বুঝলে সুন্দরী?

—আহা কি কথার ঢং! কৃত্রিম কোপে স্বামীর দিক থেকে মুখ সরিয়ে নেয় বনানী। তারপর সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করে, দিদি জামাইবাবুর পাত্রী দেখার পরে তুমি যাবে তো পাত্রী পছন্দ করতে? কথার শেষে খিল খিল করে হেসে ওঠে বনানী। লজ্জায় মাথা নিচু করে মিটিমিটি হাসতে থাকে জয়ন্তী।

বলে ওঠে পরিতোষ, খবরদার পাত্রী দেখতে তুই যাবি না, সঞ্জু।

—কেন, যাবে না কেন? জিজ্ঞেস করে বনানী।

জবাবে পরিতোষ বললে, দু'জনে মুখোমুখি বসে কি গোলমাল পাকিয়ে বসবে তার ঠিক কি? তার চাইতে রিস্ক না নেয়াই ভালো। বুঝলি সঞ্জু, দিদি—জামাইবাবু বললে নিরীহ গোবেচারীর মত জবাব দিবি, তোমাদের পছন্দই। আমার পছন্দ। তোমরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে। ব্যাস্, দারুণ খুশি হবে তোর বাবা-মা। সুবোধ বালক সাজবার এমন একটা চান্স নষ্ট করবি কেন, বল?

সাত

পাত্রী দেখার পাট শেষ। জয়ন্তীকে দারুণ পছন্দ হয়েছে সাবিত্রীর। মজুমদার সাহেবেরও অপছন্দ হয়নি। তবে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে বলেছিলেন, সবই ভালো, কেবল নাকটা আর একটু চোখা হলে—

স্বামীকে তাঁর কথা শেষ না করতে দিয়ে বলে উঠেছিলেন সাবিত্রী, কেন, নাকটা খারাপ কিসে? ঐ নাকেই তো নাকছাবি মানায়। আমি তো ভেবে রেখেছি বিয়ের পরে একখানা ছোট্ট হীরে বসিয়ে একটা নাকছাবি গড়িয়ে দেব, দারুণ মানাবে।

—হীরে? বলছো কি তুমি? বলে উঠেছিলেন মজুমদার সাহেব, আজকাল হীরের দাম জানো?

জবাব দিয়েছিলেন সাবিত্রী, যতই দাম হোক। তোমার একটা মাত্র ছেলে। তার বৌকে একটা হীরের নাকছাবি গড়িয়ে দিতে পারবে না?

মজুমদার সাহেব আর কিছু না বলে চুপ করে থাকেন। পয়সা-কড়ির ব্যাপারে তিনি বরাবরই একটু বেশি সতর্ক। আসলে তিনি তখন ভাবছিলেন সঞ্জুর চাকরির কথা। দিল্লীতে ছ'মাস ট্রেনিং শেষ হবার আগে তো আর বিয়ে হবে না। আর এই সময়ে সঞ্জুর হাতেও কিছু পয়সা-কড়ি জমবে। কাজেই গিন্নীর বৌকে হীরের নাকছাবি দেবার শখ সঞ্জুর পয়সাতেই মেটানো যাবে। তাঁর নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্সে আর হাত দেবার দরকার হবে না। তবে হ্যাঁ, বিয়ের খরচ-খরচার টাকাটা তাঁকেই যোগাতে হবে। সেই ব্যাপারেও মনে মনে একটা

কথাটা মনে পড়তেই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলেন প্রতিমা, ওমা, তুমি আবার কখন ওটা আমার কাছে দিলে?

—বাঃ, সেদিন ওটা থেকে ছক্‌টা তুলে নিয়ে ঠিকুজিটা তোমার হাতে দিইনি?

—আমাকে দিয়েছিলে? মনে মনে হেসে বলে ওঠেন প্রতিমা। তিনি জানেন পরেশ কোন কিছু হারিয়ে ফেললে প্রথমেই তাঁর মনে পড়ে সেটা তিনি প্রতিমার হাতে দিয়েছিলেন এবং 'কেষ্টা বেটাই চোর-এর মত প্রতিমাই এর জন্যে দায়ী।

জবাব দেন পরেশ, হ্যাঁ ঠিক। আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে ওটা তোমার কাছেই দিয়েছিলাম।

ছক্‌টা টুকে নিয়েছিলে কোথায় বসে?

—কেন, এই টেবিলে।

—টুকে নেবার পরে সেটা এই টেবিলের ড্রয়ারে না রেখে আমাকে দিতে গিয়েছিলে কেন?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেন পরেশ, তা ঠিক্। তবে কিনা—। সেই মুহূর্তে আর কোন জুৎসই জবাব জোগায় না পরেশের মুখে। তাই তিনি আবার বললেন, তা হলে ওটা এই ড্রয়ার থেকে গেল কোথায়? উড়ে গেল নাকি?

—তার আমি কি জানি? বলতে বলতে প্রতিমা নিজেই ড্রয়ার হাতড়ে ঠিকুজির বদলে জয়ন্তীর সেই ৬ নম্বরী ছবটা বের করে বললেন, এটা কার ছক্? এই তো জতুর নাম লেখা রয়েছে। এটা কে রাখলো এখানে?

'কৈ, দেখি—দেখি বলতে বলতে পরেশ ছক্‌টা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়েই বলে ওঠেন, ঠিকই তো। জতুর ছক্ই তো বটে। ঠিকুজি থেকে টুকে নিয়ে এটা এখানে রাখলো কে? আশ্চর্য ব্যাপার তো। এ নিশ্চয়ই টুকির কাজ।

এবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন প্রতিমা, তুমি সবেতেই ঐ মেয়েটার দোষ দেখ।

—তা'হলে কে করলো? জতু করেছে?

—জতুর বয়েই গেছে, জবাব দেন প্রতিমা, জতু, টুকি কেউই নয়। একাজ তোমার।

—আমার? রেগে ওঠেন পরেশ, এটা বুঝি আমার হাতের লেখা?

বলে ওঠেন প্রতিমা, তুমি ছাড়া জতুর ঠিকুজি-ছক্ নিয়ে আর কে নাড়াচাড়া করে, শুনি? কখন কাকে দিয়ে ছকটা লিখিয়ে রেখেছিলে তা' কি তোমার মনে আছে? যাক্‌গে, ঠিকুজি না থাক ছক্‌টা যখন পাওয়া গেছে তখন, ওটা পাঠিয়ে

দাও ওদের কাছে।

দু'নম্বরী ছক্‌টা হাতে পেয়েই পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠান মজুমদার সাহেব। তিনি এসে হাজির হতেই মজুমদার সাহেব জিজ্ঞেস করেন, পাত্রীদের যে ছক্‌গুলো আপনাকে দিয়েছিলাম সেগুলো কি আছে?

হেসে জবাব দেন পণ্ডিতমশাই, কাজ হয়ে যেতেই সেগুলো ফেলে দিয়েছি।

—বেশ করেছেন। বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব।

—কি বললেন? কথাটা ঠিক শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করেন পণ্ডিতমশাই।

সে কথার জবার না দিয়ে মজুমদার সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেন, যে পাত্রীটির সঙ্গে রাজযোটক হয়েছে তার নাম কি আপনার মনে আছে?

—আজ্ঞে —। মাথা চুলকোতে থাকেন পণ্ডিতমশাই।

—আচ্ছা, তার নাম কি অবন্তী?

—ঠিক্—ঠিক্, অবন্তীই বটে। তাড়াতাড়ি জবাব দেন পণ্ডিতমশাই, তার বাবার নাম পরেশ—পরেশ চৌধুরী—

—কি উল্টোপাল্টা বলছেন? পণ্ডিতমশাইকে এতক্ষণে প্রায় ধমকে ওঠেন মজুমদাব সাহেব, অবন্তীর বাবা পরেশ হতে যাবে কেন? সে তো জয়ন্তীর বাবা।

—আজ্ঞে, ঠিক্। ধমক খেয়ে একটু ঘাবড়ে যান পণ্ডিতমশাই।

—কি ঠিক্?

—আজ্ঞে, দু'টোই ঠিক্।

—কোন্ দু'টো ঠিক্?

এমন জেরার মুখে পড়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলেন বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই। তাড়াতাড়ি জবাব দিতে গিয়ে বলে ফেলেন, ঐ যে বললেন পরেশের বাবা অবন্তী—

—কি যে বলেন পণ্ডিতমশাই, বললেন মজুমদার সাহেব, অবন্তী কেমন করে পরেশের বাবা হবে? আসলে, আপনাব কিছুই মনে নেই। সব গুলিয়ে ফেলেছেন।

—তা' ঠিক। এতক্ষণে স্বীকার করেন বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই, বয়স হয়েছে তো! কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায় আজকাল। ঐ জয়ন্তী, অবন্তী, পরেশ—ওদের সম্পর্কগুলো ঠিক্ মনে রাখতে পারি না।

এতক্ষণে মৃদু হেসে মজুমদার সাহেব বললেন, তাই স্বাভাবিক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওসব হয়েই থাকে। তবুও তো এখনও নরেশের কথা আপনাকে বলিনি।

—নরেশ? সে আবার কে? শঙ্কিত কণ্ঠস্বর পণ্ডিতমশাইয়ের।

ব্যবহার করলেন। শত হলেও পাত্রর বাবা বলে কথা।

ভুল করেন নি পরেশ। হবু বৈবাহিকের মুখে মজুমদার সাহেব কথাটা শুনে বড়ই প্রীত হলেন মজুমদার সাহেব। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে আপন স্বভাব বিরুদ্ধ বিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, তা' বটে। পাত্রী যখন আমাদের পছন্দ হয়েছে তখন কথাবার্তা তো বলতেই হবে।

একটু থেমে মজুমদার সাহেব প্রতিমাকে বললেন, আমি খুবই দুঃখিত যে ছেলেবেলার গোটাকতক ছবি ছাড়া সঞ্জুর আর কোন ছবি আমার কাছে নেই। পাত্রর চেহারা সম্পর্কে আপনাদেরও নিশ্চয় কৌতূহল রয়েছে। দিন কয়েক আগে হলেও খোদ পাত্রকেই আপনারা দেখে নিতে পারতেন। তা, আমি দিল্লীতে সঞ্জুকে লিখছি একটা ছবি পাঠিয়ে দিতে।

বলে ওঠেন পরেশ রায়, না—না, এ নিয়ে কিছু তাড়াতাড়ি নেই। আমি ইতিমধ্যেই আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই-পোর কাছ থেকে আপনার ছেলের খবরাখবর নিয়েছি। একই কলেজের ছাত্র ওরা। আপনার ছেলে আমার সেই ভাই-পোর চাইতে এক বছরের সিনিয়র হলেও পরিচয় ছিল ওদের মধ্যে। তার মুখেই শুনেছি আপনার ছেলে নাকি দেখতে শুনতে ভালই। স্বাস্থ্যবান, গায়ের রংও ফর্সা। আর লেখাপড়ায় তো নাকি ব্রিলিয়াণ্ট।

—ভালো মানে? রাজপুত্র—অবিকল রাজপুত্র। বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, দুধে-আলতায় গায়ের রং। যাকে এক কথায় বলে সুপুরুষ, আমার ছেলে ঠিক তাই।

—হ্যাঁ, ওঁনার ভাই-পো মনো অর্থাৎ মনোতোষও সেই কথাই বললে, স্মিত হসে প্রতিমা বললেন, মনো তো আমাকে আরও বললে, কাকীমা দারুণ দেখতে ছেলে। জতুর সঙ্গে দারুণ মানাবে। একেবারে নাকি হরগৌরী। কথার শেষে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠতেই পুত্র-গর্বে সাবিত্রীর মুখেও হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

—তা'হলেই দেখুন, বলতে থাকেন পরেশ, পাত্রর ব্যাপারে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত। আর বিয়ে হতেও তো এখনো দেরি আছে। তার আগে কথাবার্তা বলে আমরা একেবারে পাকা করে রাখতে চাই। বুঝতেই তো পারছেন মজুমদার সাহেব, আমি হচ্ছি পাত্রীর বাবা। ভাবনা-চিন্তা তো আমারই বেশি।

—তা' তো বটেই, অমায়িক সুরে বললেন মজুমদার সাহেব, কথাবার্তার আর তেমন কী আছে? আপনার কন্যা আমার পুত্রবধূ হয়ে আমার বাড়ি আসবে, এটা তো আমরা ঠিক করেই ফেলেছি। কথার মধ্যে এটাই তো আসল কথা।

—তা' ঠিক, বিগলিত ভঙ্গিতে বললেন পরেশ, তবুও কিছু কথাবার্তা তো থাকেই। এই ধরুন দেনা-পাওনার ব্যাপারটা।

—এই দেনা-পাওনার ব্যাপারটা মিটলেই কি সব মিটে যায়? জিজ্ঞেস করেন মজুমদার সাহেব।

—সব কি আর মেটে? জবাব দেন পরেশ, বিয়ে বলে কথা। তবে অনেকটাই মেটে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ওটাই তো বড় চিন্তা।

একটু সময় চিন্তা করেন মজুমদার সাহেব। তারপর গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করেন, বেশ, তা'হলে আপনিই বলুন মেয়ের বিয়েতে আপনি কত খরচ করতে চান?

মজুমদার সাহেবের কথাটা সেই মুহূর্তে ঠিক ভালো লাগে না পরেশের। 'কত খরচ করতে চান কথাটার চাইতে তিনি যদি 'মেয়ে জামাইকে কি দিতে চান' জাতীয় কোন কথা বলতেন তা'হলে বোধহয় সেটা শ্রুতিমধুর হতো বলে তাঁর মনে হয়।

একটু সময় চুপ করে থাকেন পরেশ। একবার তাকান স্ত্রী প্রতিমার দিকে। তারপর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দেন, দেখুন মজুমদার সাহেব, আমার বড় দু'টি মেয়ের বিয়েতে যা খরচ করেছি তেমনি খরচই করবো।

সামান্য হেসে মজুমদার সাহেব বললেন, দেখুন রায়মশাই, আপনার বড় দুটি মেয়ের বেলায় আপনি কি খরচ করেছেন তা' তো আমি জানি না। আচ্ছা হ্যাঁ, কত ভরি সোনা দেবেন মেয়েকে?

মজুমদার সাহেবের প্রশ্নে মনে মনে আর একবার ধাক্কা খান পরেশ রায়। এই বাজারে সোনার পরিমানের কথা জিজ্ঞেস করা প্রায় ভদ্রতার বাইরেই পড়ে। বড় জোর জিজ্ঞেস করা চলে 'মেয়েকে কি কি দেবেন'।

জবাব দিতে গিয়ে পরেশ রায় আর একবার তাকান নিজের স্ত্রীর দিকে। তারপর জবাব দেন, দেখুন মজুমদার সাহেব, আপনার সোস্যাল পজিশন আমি জানি। মেয়েকে এমন ভাবে সাজিয়ে দেব যে কেউ ছি-ছি করে আপনার সম্মান হানি করতে পারবে না।

—বেশ—বেশ। খুবই ভাল কথা। মজুমদার সাহেব খরচের পরিমাণ কিম্বা সোনার পরিমাণ জানার জন্যে আর পীড়াপীড়ি না করে কেবল বললেন, দেখুন রায়মশাই, আমার একমাত্র ছেলে। এই যে বাড়িঘর দেখছেন এর একমাত্র মালিক আমার ঐ ছেলেই। সবে চাকরিতে ঢুকেছে সে। তা'ছাড়া আমিও রিটায়ার করেছি। বিষয়-আশয় আমার যা-ই থাক না কেন নগদ পয়সা-কড়ি কিন্তু আমার তেমন কিছুই নেই। কাজেই আমার খরচ-খরচা

ছক তিনি তৈরি করেই রেখেছেন। ভেবে রেখেছেন যে মাছের তেলেই মাছ ভাজার চেষ্টা করবেন। অবশ্যি শেষ পর্যন্ত কি হবে তা' তিনি এখনই বলতে পারেন না।

সঞ্জয় তার ছোট মামার নির্দেশমত মা-বাবার কাছে 'সুবোধ বালক' আখ্যা নিয়েই দিল্লী চলে গেছে। সাবিত্রীকে নিরীহ ভঙ্গিতে বলে গেছে, ওসব দেখাদেখির মধ্যে আমাকে টেনো না মা, তোমাদের ঘরের বৌ, তোমরা যা ভালো বুঝবে করবে। তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ।

দারুণ খুশি হয়েছিলেন সাবিত্রী ছেলের কথায়। হেসে বলেছিলেন মজুমদার সাহেবকে, এত লেখাপড়া শিখেও কিন্তু আমাদের সঞ্জু আজকালকার ছেলেদের মত নয়। নিজে দেখবো—নিজে যাচাই করবো ইত্যাদির মধ্যে একেবারেই নেই। তোমার-আমার ওপরই পছন্দের ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছে।

—সেটাই তো মুশকিল গিন্নী, বলে উঠেছিলেন মজুমদার সাহেব, অপছন্দ হলে তখন সব দোষ আমাদের ওপর চাপবে।

—ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমাকে সঞ্জুর অপছন্দ হবে? বলেছিলেন সাবিত্রী, ছেলের নজর আমি জানি। তুমি দেখে নিও, মেয়েটিকে সঞ্জুর অবশ্যই পছন্দ হবে।

—হলেই ভালো।

—তা'হলে তুমি আর দেরি করো না। পাকা কথা দিয়ে দাও।

—এখনই কিসেব পাকা কথা? বিস্মিত কণ্ঠস্বর মজুমদার সাহেবের, পরেশবাবুকে ডেকে পাঠাই। তিনি আসুন। কথাবার্তা হোক। তারপরেই না পাকা কথা। সেই কথায় আছে না, লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না? লাখ তো দূরের কথা, হাজারই তো এখনও পূর্ণ হয়নি।

—সে তুমি লাখ-হাজার নিয়ে থাকো। আমি কিন্তু ঐ মেয়েকেই ঘরে আনবো।

স্ত্রীর কথায় মজুমদার সাহেব কেবল সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে একটু হেসেছিলেন।

দিল্লী যাবার আগের দিন পবিতোষের আমন্ত্রণে সঞ্জয় ও জয়ন্তী এসেছিল তার বাড়িতে। দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে খাইয়েছিল বনানী। হেসে বলেছিল, দু'জনের একসঙ্গেই আইবুড়-ভাত হয়ে গেল।

বলে উঠেছিল পরিতোষ, তা' ঠিক। বর-কনের একসঙ্গে আইবুড় ভাত সচরাচর দেখা যায় না। তা, সঞ্জুর বিয়ের ব্যাপারে সবকিছুই তো বিচিত্র। সেই-বীনা মেয়েটির কথা মনে পড়ছে—নিগোসিয়েশন-লভ্ ম্যারেজ। একদিকে চুটিয়ে চলছে 'লভ্', অন্যদিকে চলছে নিগোসিয়েশন।

পরিতোষের কথায় লজ্জায় জয়ন্তীর গাল দু'খানি লাল হয়ে উঠেছিল।

সেই দিকে তাকিয়ে পরিতোষ আবার বলেছিল, যাক্‌গে ভালয় ভালয় সব চুকে গেছে। দিদি জামাইবাবুর পাত্রী পছন্দ হয়েছে। একেবারে রাজযোটক! এতদিনে আমার কাজ শেষ। এবার পাত্র-পাত্রীর গার্জেনরা বসে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করুক।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই পরিতোষ সঞ্জয়কে বলেছিল, হ্যাঁরে সঞ্জু, তুই তো দিল্লী চললি। ছ টি মাসের মধ্যে তো আর এমুখো হবি না। তা, দিল্লী বসে জয়ন্তীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি কেমন করে? জয়ন্তীর বাড়িতে তো আর চিঠি-পত্র পাঠাতে পারবি না। শোন, আমি একটা ব্যবস্থার কথা ভাবছি। জয়ন্তীর চিঠি তুই আমার এখানে পাঠাবি। আর জয়ন্তী সোজাসুজি তোর ঠিকানায় লিখবে। ব্যাস্‌, হয়ে গেল। চিঠি-পত্রের মাধ্যমেই তোদের বিরহজ্বালা খানিকটা ঘুচবে। কি বলিস, জয়ন্তী?

—তুমি যেন কী? স্বামীকে ধমকে উঠেছিল বনানী, তুমি না ওর মামাশ্বশুর হতে চলেছ? হবু ভাগ্নে বউ ও ভাগ্নের সঙ্গে কেউ এভাবে ঠাট্টা করে নাকি?

—আরে রেখে দাও তোমার মামাশ্বশুর, বলে উঠেছিল পরিতোষ, শাস্ত্রেই তো রয়েছে, সাবালক পুত্রের সঙ্গে বাপ পর্যন্ত বন্ধুর মত আচরণ করবে। আমি তো কেবল মামা।

কথায় বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। জন্ম-মৃত্যুর-ব্যাপারটা বিধাতার ওপর ছেড়ে দিতে পারা গেলেও বিয়ের ব্যাপারে বোধহয় ঐ ব্যক্তিটির ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপানো চলে না। এ বিষয়ে মানুষের হাতও অনেকখানি। মানুষের স্বভাব দোষে পাকা ঘুঁটি পর্যন্ত কাঁচা হয়ে যায়। তখন দোষ পড়ে ঐ বিধাতার ওপর। তাই যদি না হবে তা'হলে সঞ্জয়-জয়ন্তীর বিয়ের পাকা ঘুঁটিটি শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়বে কেন?

স্ত্রী প্রতিমাকে নিয়ে পরেশ রায় এলেন মজুমদার সাহেবের বাড়ি। পরস্পর কুশল বিনিময়ের পরে চা-মিষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরেশ ও মজুমদার সাহেব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলেন। ওদিকে সাবিত্রী ও প্রতিমা তখন বাড়ির ঝির কাজে গাফিলতি, রান্নার গ্যাসের অনিয়মিত সাপ্লাই ও তজ্জনিত সাংসারিক দুর্ভোগ ইত্যাদির মধ্যে মগ্ন হয়ে রইলেন। অবশেষে একসময় পরেশ বললেন, তা'হলে এখন বিয়ের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলতে হয়, মজুমদার সাহেব।

পরেশ রায় ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন যে 'সাহেব' শব্দটির ওপর এই মানুষটির একটু অতিরিক্ত দুর্বলতা। তাই তিনি মানুষটিকে খুশি করতেই শব্দটি

মজুমদার সাহেবের চিঠি পেয়ে প্রতিমা খানিকটা বিমর্ষ, আর পরেশ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কেবলমাত্র সোনা ও নগদেই যদি তাঁকে লাখখানেকের মত খরচ করতে হয় তা'হলে গো.টা বিয়ের খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কাজেই তিনি ঘোষণা করলেন এই সম্বন্ধ তিনি অবশ্যই ভেঙ্গে দেবেন। এমন রাঘব বোয়াল বাপের ছেলের হাতে তিনি কিছুতেই মেয়েকে তুলে দেবেন না।

কথাটা কানে যেতেই মুষড়ে পড়লে জয়ন্তী। ঘাটে এসে যে নৌকা ডুবতে বসলো। এখন উপায়? এ নিয়ে যার সঙ্গে কথা বলা যেত সেই মানুষটা তো এখন দিল্লীতে। অবশ্য তাকে চিঠি লিখে সে সবকিছু জানাতে পারে, কিন্তু তাতে লাভ কি? অত দূরে বসে সে কী করতে পারবে? তা ছাড়া বাপের ঐ ডিম্যাণ্ড থেকে তাদের রেহাই দেবার মত ক্ষমতাই বা তার কোথায়? বাপের সামনে তো সে একেবারেই কেঁচো। একমাত্র ভরসা ছোটমামা অর্থাৎ পবিতোষ নিজের বিয়ের ব্যাপারে তার কাছেই বা সে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে? লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়ে নিজের বিয়ের তদ্বির করতে সে কিছুতেই যেতে পারবে না তার কাছে। তা'হলে সে এখন কি করবে?

ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেও বাড়িতে সেই অস্থিরতা প্রকাশের কোনই সুযোগ নেই জয়ন্তীর। এমন এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে তার সবটুকু অভিমান গিয়ে জমা হয় সঞ্জয়ের ওপর। বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিল্লীতে বসে ট্রেনিং নিচ্ছে লোকটা। এদিকে জয়ন্তী ভাবনা-চিন্তায় অস্থির। একা নিজের ঘরে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। কল্পনায় সে কখনও ছুটে যায় সোজা মজুমদার সাহেবের কাছে। শাড়ির আঁচল গাছ কোমর করে বেঁধে কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে থাকে তাঁকে। কখনও বা গিয়ে দাঁড়ায় নিজের বাবার কাছে। সোজাসুজি বলে, তোমার অবস্থা তো এমন নয় বাবা, যে নগদে-সোনায় লাখখানেক টাকা খরচ করতে পারো না। একদিন তোমার এই বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সার মালিক তো হবো আমরা চার বোনই। সেদিন না হয় আমার ভাগ থেকে এই একলাখ কাটা যাবে। কল্পনায় কখনও বা সে ছুটে চলে যায় দিল্লী। গিয়ে বলে সঞ্জয়কে, বেশ লোক তুমি! কোন্ আক্কেলে সবকিছু ফাইনাল না করে তুমি এখানে চলে এলে?

কার্যক্ষেত্রে একমাত্র ভাবনা-চিন্তা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না জয়ন্তী। নিজের পড়ার টেবিলে খোলা বইয়ের সামনে গালে হাত দিয়ে কেবল বসে থাকে। প্রতিমা কিছু জিজ্ঞেস করলে পাশ কাটিয়ে যায়। ছোটবোন টুকি দিদির হাব-ভাবে বিসদৃশ লক্ষ্য করে কিছু জিজ্ঞেস করলে ধমক খায়।

কেবল বাড়িতেই নয়, কলেজেও জয়ন্তীর একই অবস্থা। তাই একদিন

কলেজে রীনা ও মায়া চেপে ধরলো তাকে। বললে, বল তো কী হয়েছে? এ ভাবে মনমরা হয়ে থাকিস কেন তুই? দিল্লী থেকে চিঠি পত্র পাসনি বুঝি? কথাটা জিজ্ঞেস করেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুচকি হাসে রীনা।

কোন জবাব দেয় না জয়ন্তী। ঘাড় দুলিয়ে মায়া রীনাকে বললে, বুঝলি না, এসব হচ্ছে কোর্টশিপের এফেক্ট। বিয়ের ব্যা—ব্যাব—আই মিন্—।

—ব্যা—ব্যা করছিস কেন ছাগলের মত? মায়াকে ধমকে ওঠে রীনা, বাংলা ভাষায় তোকে এখনও মানুষ করে তুলতে পারলাম না রে। কি বলতে চাইছিস তুই?

সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দেয় মায়া, বন্দোবস্ত—আই মিন, এ্যারেঞ্জমেণ্ট।

—ব্যবস্থা।

—ঠিক—ঠিক, বলে ওঠে মায়া, বিয়ের ব্যবস্থা তো একদম পাকা। তার আগে কোর্টশিপের মিঠে—আই মিন, সুইট্‌নেসটুকু এনজয় করতেই বোধহয় ওদের মধ্যে মান-অভিমানের রিহার্সাল চলছে।

জয়ন্তীর ব্যাপারে এরকম একটা কিছু অনুমান করাই রীনা ও মায়ার পক্ষে স্বাভাবিক। যেখানে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা সেখানে জয়ন্তীর এমন মনমরা ভাবের অর্থ ঐ ধরনের একটা কিছুই হতে পারে। রীনা ও মায়া জানতো যে সঞ্জয় দিল্লী যাবার আগেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। পরিতোষের কৌশলে কদমতলার নরেশের মেয়ে অবন্তী যে নাকতলার পরেশের মেয়ে জয়ন্তীতে পরিণত হয়ে রাজযোটকের বদলে একেবারে মহারাজযোটকের লেবেল এঁটে মজুমদার সাহেব ও তাঁর মেমসাহেবের কাছে পছন্দের পাত্রী হয়ে উঠেছিল এইসব খবর আজানা ছিল না রীনা ও মায়ার। এমনকি পরিতোষের বুদ্ধির তারিফ করতে রীনা ও মায়া একদিন পরিতোষের ফ্ল্যাটে গিয়ে পরিতোষ ও তার মন্ত্রী বনানীকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েও এসেছিল। কাজেই তারা এরপরে ধরেই নিয়েছিল যে সঞ্জয় ও জয়ন্তীর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু দেনা-পাওনার মত একটা কুৎসিত নিয়ম যে মাঝখানে এসে হাজির হয়ে সবকিছু বানচাল করে দিতে বসেছে সে খবর তারা পায় নি তখনও।

হাসি-ঠাট্টায় জয়ন্তীকে তাতিয়ে তুলতে না পেরে কলেজে মেয়েদের কমন রুমে বসে একদিন গম্ভীর স্বরে রীনা জিজ্ঞেস করে জয়ন্তীকে, সত্যি করে বল তো, কী হয়েছে?

এতদিনে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় জয়ন্তীর। রীনার মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

গুরুতর কিছু অনুমান করে রীনা ও মায়া জয়ন্তীর আরও একটু কাছে সরে

হিসেবে কিছু নগদ কিন্তু আপনাকে দিতে হবে।

—নগদ—মানে, পণ? পরেশ রায়ের কণ্ঠে বিরক্তি।

পরেশ রায়ের বিরক্তি গায়ে না মেখে জবাব দেন মজুমদার সাহেব, তা, আপনি ওটাকে যে নামেই ডাকুন না কেন, নগদ কিছু অবশ্যই প্রয়োজন।

—কত? জিজ্ঞেস করেন পরেশ রায়, পণ হিসেবে কত দিতে হবে?

একটু দ্বিধায় পড়েন মজুমদার সাহেব। নগদের কথা ভাবলেও তার পরিমাণ সম্পর্কে তিনি আগে থেকে কিছু ভেবে রাখেন নি। কি জবাব দেবেন? কত চাইবেন? বৌভাতের পুরো খরচাটাই চাইবেন নাকি?

বুদ্ধিমান মজুমদার সাহেব ভাবনা-চিন্তা না করে টাকার পরিমাণ সম্পর্কে সেই মুহূর্তে কিছু বলতে রাজি হন না। বললেন, আজ থাক। এ সম্পর্কে দু'চার দিনের মধ্যেই আপনাকে জানাবো।

মজুমদার সাহেবের বাড়ি থেকে অনেকটা নিরাশ হয়েই সেদিন উঠলেন পরেশ রায় ও প্রতিমা। পথে যেতে যেতে পরেশ জিজ্ঞেস করেন প্রতিমাকে, কিগো, কেমন বুঝলে?

ম্লান স্বরে জবাব দেন প্রতিমা, ছেলের বিয়েতে দাবী-দাওয়ার ব্যাপারটা এদেশে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভদ্রলোক চাঁছা-ছোলা ভাষায় যেভাবে কথা বললেন তা' আমার ভালো লাগলো না।

—অভদ্র—একেবারেই অভদ্র, বলে ওঠেন পরেশ, 'কত খরচ করবেন—কত ভরি সোনাদানা দেবেন' জাতীয় কথা যে এযুগে কোন ভদ্রলোক উচ্চারণ করতে পারে সেটাই আশ্চর্য। পণ, যৌতুক ইত্যাদি যারা চায় তারাও কথাগুলো একটু অন্যভাবে বলে। এ ভদ্রলোকের দেখছি চোখে পর্দা পর্যন্ত নেই। এমন ঘরে মেয়েকে পাঠাবো কিনা তা-ই এখন ভাবছি।

স্বামীর কথায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন প্রতিমা, বাপ যাই হোক না কেন, মা মানুষটি কিন্তু সত্যিই ভালো। তা'ছাড়া পাত্রটি তো এক কথায় চমৎকার। মনো সেদিন যেভাবে পাত্রটির প্রশংসা করলে তাতে তো মনে হয় এমন একটি পাত্র খুব সহজে মেলে না। জতুর জন্যে তো আরো অনেক পাত্র দেখলে, কিন্তু কোনটাই তো তেমন পছন্দসই হলো না।

—কিন্তু তাই বলে এমন একটা অভদ্র লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করা কি ভালো? একে তো নিজেকে একটা কেউকেটা ভাবেন। সাহেব না হাতি! তারওপর কথাবার্তা ঐ রকম।

—তা' তুমি যাই বলো বাপু, এতক্ষণে যেন মজুমদার সাহেবের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েন প্রতিমা, একদিক থেকে মানুষটাকে কিন্তু ভালই বলতে হবে।

রাখ-ঢাক বলে কিছু নেই। সোজাসুজি কথা। একদল লোক আছে যারা প্রথমে শুরু করে কোন দাবী-দাওয়া নেই বলে। তারপর একটু একটু করে আকার-ইঙ্গিতে এমন সব দাবী হাজির করে যাতে নাকি চমকে উঠতে হয়।

স্ত্রীর কথায় কোন জবাব দেন না পরেশ রায়। প্রতিমা আবার বললেন, যাক গে, এখনই এমন একটি পাত্র হাতছাড়া করার মত কিছু হয় নি। আগে দেখ ভদ্রলোকের দাবীর বহর।

পাত্রটি যে ভালো তা' পরেশ রায় নিজেও স্বীকার করেন। বিয়ের সময় তার বড় জামাতা ছিল ইণ্ডিয়ান অয়েলের একজন ক্লার্ক আর মেজ জামাতা স্টেট্ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হলেও একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সামান্য চাকরি করতো। কেবলমাত্র তাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই পরেশ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিজের দুই মেয়েকে। হিসেবে ভুল হয়নি তাঁর। বড় জামাই এখন অফিসার, আর মেজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাদের তুলনায় এই পাত্রটি তো ঢের ভালো। তাই এর জন্যে কিছু বেশি খরচ-পত্রেও আপত্তি ছিল না পরেশের। তাঁর আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে এরকম একটি পাত্রর জন্য তিনি মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে পারেন না। ভেবেছিলেন, জিনিসপত্র ভালই দেবেন। প্রথম দুই মেয়েকে যখন ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টি ভি. পর্যন্ত দিয়েছেন, তখন জবুর বেলায় এমন একটি সুপাত্রের জন্যে কালার্ড টি. ভি. পর্যন্ত দিতে তিনি রাজী। চাইলে ফ্রিজও দেবেন। কিন্তু ঐ নগদ টাকার ব্যাপারেই পরেশের ঘোরতর আপত্তি। পাত্রের বাবা টাকা নিয়ে ছেলে বেচতে চাইলেও, তিনি নগদে জামাই কিনতে রাজী নন।

অবশেষে একদিন মজুমদার সাহেবের কাছ থেকে একখানা দীর্ঘ চিঠি এলো পরেশের কাছে। কথাবার্তা যাইহোক, চিঠি লেখার ঢংয়ে মজুমদার সাহেব সিদ্ধহস্ত। চিঠির প্রথমে তিনি জানালেন যে পাত্রীর বাবা-মার আচরণে ও কথাবার্তায় তিনি মুগ্ধ। এমন বাবা-মা'র মেয়ের স্বভাব যে খুবই ভালো হবে সে সম্পর্কে তিনি নাকি নিঃসন্দেহ। এর পরে পাত্রীর প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে তার প্রশংসায় সাহেব একেবারে পঞ্চমুখ। এমন একটি পাত্রীকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে দেখতে পেলে তিনি যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন সেকথাও বিন্দুমাত্র গোপন করেন নি তিনি। অবশেষে এলো দেনা-পাওনার প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে মজুমদার সাহেব স্পষ্টই জানালেন যে কম পক্ষে মেয়েকে পনেরো-ষোল ভরি সোনা না দিলে চলবে না। তা ছাড়া, তাঁর একমাত্র পুত্রের বৌভাতের খরচের একটা অংশ বহন করতে হবে পরেশকে। সেই খরচের অঙ্ক কমপক্ষে মাত্র হাজার পঁচিশেক।

আসে। রীনা জয়ন্তীর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললে, চুপ করে থাকিস না জয়ন্তী, বল না কি হয়েছে ?

মনের চাপা আবেগ প্রকাশের সুযোগ এবার আর ছেড়ে দেয় না জয়ন্তী। মনটাকে হালকা করতে গিয়ে রুমালে চোখ মুছে ধীরে ধীরে সে বলতে থাকে, সেই দেনা-পাওনার কথা।

শুনতে শুনতে সদাহাস্যময়ী রীনার মুখখানা থমথমে হয়ে উঠলেও মায়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে উঠে, বলিস কিরে জয়ন্তী ? দশ-পনেরো ভরি সোনা-চাঁদির কথা ছেড়ে দে। ও তো তোর জিনিস তোর কাছেই থাকবে। কেবল ঐ পঁচিশ হাজার রুপিয়া। তাজ্জব কি বাৎ! ওরকম একটা পাত্রের জন্যে পঁচিশ হাজার কি খুব বেশি হলো ? আমাদের বিহারে ঐ রকম একটি পাত্রের দর দু'তিন লাখে উঠতো, বুঝলি ?

—ছাড় তো তোর বিহারের কথা! মায়াকে ধমকে ওঠে রীনা, এ তোর বিহার-ইউ. পি. নয়। এ হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল।

একটু থেমে রীনা আবার জিজ্ঞেস করে জয়ন্তীকে, তোর বাবা কি তা'হলে সম্বন্ধটা নাকচ করে দিয়েছেন ?

—না, দেননি এখনও, মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় জয়ন্তী, তবে বোধহয় দেবেন। তাই দেখছি, খবরের কাগজ দেখে নতুন পাত্রের সন্ধান শুরু করেছেন।

একটু চিন্তা করে রীনা জিজ্ঞেস করে, দিল্লীতে সঞ্জয়বাবুকে কি খবরটা জানিয়েছিস্ ?

—না। তাতে লাভ হবে না কিছু। বাপকে সে বাঘের মত ভয় করে।

অনেকটা নিজের মনেই মন্তব্য করে রীনা, ভয় না করলেও কোন কাজ হতো বলে মনে হয় না। এই একটা ব্যাপারে এদেশের ছেলেরা তাদের মা-বাবার খুবই বাধ্য।

—সঞ্জয়বাবুর মামা-মামী অর্থাৎ আমাদের দাদা-বৌদি কি ব্যাপারটা জানেন ? গিয়েছিলি তাদের কাছে ?

—কি যে বলিস তুই ? জয়ন্তীর বদলে এবার জবাব দেয় মায়া, নিজের বিয়ের ব্যাপারে কি ওর পক্ষে সেখানে গিয়ে প্লিডিং আর্ইসন্ ওকালতি করা ভাল দেখায় ?

—ঠিক বলেছিস। মায়ার বুদ্ধির ওপর এতক্ষণে খানিকটা আস্থা প্রকাশ করে রীনা। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললে, বিষয়টা সত্যিই গুরুতর। ভাবতেই পারিনি এমন একটা পরিস্থিতি হবে।

একটু থেমে রীনা এবার মায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, কাল তো রবিবার। কাল খুব সকালে তুই ও আমি একবার যাবো দাদা-বৌদির কাছে। দাদার

বুদ্ধির ওপর অগাধ বিশ্বাস আমার। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

রীনার মুখে কথাটা শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে পরিতোষ। তারপর বললে, বড়ই একরোখা মানুষ আমার জামাইবাবু। সাংসারিক যে কোন ব্যাপারে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কেউ কিছু বলতে গেলে তাঁর জেদ আরও বেড়ে ওঠে। এটাই তাঁর চিরকালের স্বভাব। আমি তো কোন্ ছাড়, আমার দিদি পর্যন্ত পাত্তা পায় না তাঁর কাছে। তাই ভাবছি, এখন একমাত্র পথ পরেশবাবুর রাজি হয়ে যাওয়া। টাকার অঙ্ক যখন খুব একটা বেশি নয়, আর ঐ টাকা খরচ করার সামর্থ্য যখন তাঁর আছে তখন তিনি রাজি হলেই বোধহয় সবদিক রক্ষা হয়।

এই সময় বলে ওঠে বনানী, আমি তো ভাবছি এই টানাপোড়েনের মধ্যে সঞ্জয় আবার বেঁকে না বসে। হয়তো বলে বসবে বিয়েই করবো না।

—জামাইবাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে? বলে ওঠে পরিতোষ।

জবাব দেয় বনানী, বাপের কথায় না বলার ক্ষমতা যদিও ওর নেই, তবুও বলা তো যায় না কিছু। ঐ বাপেরই তো ছেলে।

আবার একটু চিন্তা করে পরিতোষ রীনাকে জিজ্ঞেস করে, 'পরেশবাবু কি সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছেন?

—এখনও দেন নি। তবে দেবেন বলেই মনে হয়। নতুন পাত্রের সন্ধান নাকি শুরু করেছেন।

—একটা কাজ কর, বলতে থাকে পরিতোষ, তুই একবার যা পরেশবাবুর কাছে। চেষ্টা কর তাঁকে রাজি করাতে।

—যদি রাজি না হয়?

—তখন না হয় অন্য কিছু চিন্তা করা যাবে।

—কিন্তু কি ভাবেই বা কথাটা পাড়বো তাঁর কাছে?

—তোর মত মেয়েকে কি তা' শিখিয়ে দিতে হবে?

রীনাকে দেখেই পরেশ হেসে বললেন, এসো মা, এসো। অনেকদিন এদিকে আসো নি।

—হ্যাঁ মেসোমশাই, জবাব দেয় রীনা, লেখাপড়ার চাপ এতই বেশি যে একদম সময় করে উঠতে পারি না। জয়ন্তীর কাছ থেকে একটা দরকারি নোট্ নেবো বলেই আজ এসেছি।

—ভালই করেছ, মা বলে ওঠেন পরেশ, তোমার তো দেখছি লেখাপড়ার দিকে খুবই ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু তোমার বান্ধবীর চাল-চলনে তো তা' মনে হচ্ছে না। মাঝে-মাঝেই তো ছুতোনাতায় কলেজ কামাই করে। তাই তো

ভাবছি এবার মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হবো। ইচ্ছে থাকলে শ্বশুরবাড়ি গিয়েও লেখাপড়া করতে পারবে।

—তা' পারবে, জবাব দেয় রীনা, শুনেছি পাত্রের বাবা-মা নাকি লেখাপড়ায় খুব উৎসাহী।

রীনার কথায় পরেশ রায় একটু সময় তার মুখের দিকে অবাক্ চোখে তাকিয়ে থাকেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তুমি মা কোন্ পাত্রর কথা বলছো?

স্বাভাবিক সুরে জবাব দেয় রীনা, ঐ যে, মানিকতলার সেই পাত্রটি যার সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে ঠিক করেছেন।

—ঠিক করেছি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর পরেশের, কে বললে তোমাকে?

—তেমনিই তো শুনলাম মেসোমশাই, নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দেয় রীনা, মানিকতলার ঐ মজুমদার বাড়ির পেছনের বাড়িটাই তো আমার এক পিসতুতো দাদার শ্বশুরবাড়ি। বৌদির কাছেই তো শুনলাম পাত্রটি নাকি ব্রিলিয়াণ্ট। এমন পাত্র নাকি লাখে একটি পাওয়া যায়।

—পাত্রটি সম্পর্কে তোমার বৌদি এই কথা বলেছে বুঝি?

মাথা নেড়ে সায় দেয় রীনা, হ্যাঁ মেসোমশাই, ইলেকট্রনিক্‌সে ফার্স্ট ক্লাশ। তার ওপর জোকার ম্যানেজমেণ্ট পাশ। একটা মস্ত বড় ফার্মে চাকরি পেয়েছে।

পরেশ রায় বুঝতে পারেন তার মেয়ের এই বান্ধবীটি সব খবরই রাখে। গম্ভীর মুখে একটু সময় চুপ করে থেকে তীর্যক কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, তোমার সেই বৌদি দেখছি সবই জানে। পাত্রটি বাস্তবিকই ভালো। তবে তোমার বৌদি বোধহয় এটা জানে না যে পাত্রর বাবা একটি সাক্ষাৎ রাঘববোয়াল। ছেলে বিক্রির টাকার জন্যে মস্তবড় হাঁ-করে আছে।

মুখে চোখে বিস্ময়ের ভান করে রীনা বললে, তাই নাকি, মেসোমশাই? মোটা টাকা পণ চেয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ মা, জবাব দেন পরেশ, নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। তা'ছাড়া পনেরো ষোল ভরি সোনা আর অন্যান্য জিনিসপত্র তো আছেই।

—খুবই অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়, বলে ওঠে রীনা, কিন্তু শুনেছি ওদের অবস্থা নাকি খুবই ভালো।

জবাব দেন পরেশ, ঠিকই শুনেছ মা। খুব ভালো অবস্থা। কিন্তু সেই কথায় আছে না, শকুন যত উঁচুতেই উড়ুক না কেন, তার নজর থাকে ঐ ভাগাড়েরই দিকে। এও তাই। ভালো পাত্রর জন্যে খরচ করতে আমি রাজি। কিন্তু তাই বলে নগদ পয়সা কড়ি দিতে আমি একদম রাজি নই। জামাই কেনার ঘোর বিরোধী আমি।

পরেশ ও রীনার কথার মধ্যেই ঘরে ঢোকেন প্রতিমা। স্বামীর কথার জবাবে অখুশি কণ্ঠে বললেন, লোকটি তো কেবল তার দাবী-দাওয়া জানিয়েছে। এবার তার কাছে যেতে হবে, এনিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।

কথা বলতে বলতে প্রতিমা রীনার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে থাকেন, তুমিই বলো তো মা, ছেলের বাপ দাবী করলো, আর আমি রাগ করে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলাম, এটা কি কোন কাজের কথা হলো? পাত্রটি যখন ভালো তখন একবার সেখানে যেতে আপত্তি কি? বুঝলে মা, তোমার মেসোমশাই ঠিক্ করেছে ওখানে আর যাবেই না।

প্রতিমার কথায় মনে খানিকটা বল পায় রীনা। পরেশকে বললে, মাসিমা কথাটা খারাপ বলেন নি। পাত্র যখন ভালো তখন একবার সেখানে যেতে পারেন। দেখুন না, পাত্রর বাবা কি বলে।

—নতুন কথা আর কি বলবে? বিরক্তির সুর পরেশের কণ্ঠে, বেশি অনুরোধ করলে হয়তো পঁচিশের জায়গায় বিশ হবে। তাই বলে এ ধরনের মানুষ কি বিনে পণে রাজি হবে ভেবেছ?

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন প্রতিমা, একটি ভালো পাত্রর জন্যে না হয় টাকাটা খরচ করলে।

—কি বললে? রেগে ওঠেন পরেশ, পয়সা দিয়ে জামাই কিনতে বলছো?

জবাব দেন প্রতিমা, তোমাদের মনোভাব আমি বুঝিনা বাপু। একটি ভালো জিনিস যদি কেউ বেচতে চায়, তা'হলে আমি কিনবো না কেন? আমি না কিনি তো অন্য কেউ কিনবে। জিনিসটি হাত ছাড়া হবে আমার।

প্রতিমা আবার রীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা বাপু একালের ছেলে-মেয়ে। এসব পণ-টন তোমরা পছন্দ করো না। সত্যি বলতে কি, আমিও একে ভালো বলি না। কিন্তু তাই বলে এজন্যে একটি ভালো পাত্র হাতছাড়া করতে আমার ইচ্ছে নেই। আমার যদি ক্ষমতা থাকে তা'হলে খরচ করবো না কেন? পণ-প্রথার বিরুদ্ধে চারিদিকে কত কথাই না শুনছি, তাই বলে এটা কি বন্ধ হয়েছে? তোমরা বাপু যে যাই বলো, আমি বুঝি, ভালো জিনিসটি পেতে হলে ভালো খরচ করতে হবে। তা' সে নগদেই হোক্, আর জিনিসপত্রেই হোক্। কথার শেষে ঘর থেকে চলে যান প্রতিমা। পাছে মেয়ের বান্ধবীর সামনে এনিয়ে স্বামীর সঙ্গে আরও বেশি কথা কাটাকাটি হয়। সেই ভয়েই তিনি সরে পড়েন।

মেঘ না চাইতেই জল। রীনা ভাবতেই পারেনি প্রতিমা এভাবে তার কাজটা সহজ করে দেবে। সুযোগটুকু গ্রহণ করে সে এবার পরেশকে বললে

তা, মেসোমশাই, আপনি একবার যেতে পারেন পাত্রের বাড়ি! বিশেষ করে মাসিমার যখন এই পাত্রটিকেই পছন্দ।

পরেশ কোন জবাব না দিয়ে কেবল গোঁজ হয়ে বসে থাকেন। রীনা মনে মনে বুঝতে পারে, প্রতিমার কথায় আর যা হোক, এই মুহূর্তে পরেশ সম্বন্ধটা ভেঙে দেবেন না। যাক, আপাতত এটুকুই লাভ।

শেষ পর্যন্ত মজুমদার সাহেবের বাড়ি যাওয়াই ঠিক করলেন পরেশ রায়। মনে আশা, মুখোমুখি কথাবার্তায় মজুমদার সাহেব হয়তো পণের জন্যে চাপ নাও দিতে পারেন।

বেশ হাসি মুখেই মজুমদার সাহেব ও সাবিত্রী ঘরে এনে বসালেন পরেশ রায় ও প্রতিমাকে। চা-জলখাবারের পাট শেষ হতেই পরেশ রায় একটু নড়েচড়ে বসে স্ত্রীর দিকে তাকান। একটা ঢোক গিলে প্রতিমা মজুমদার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার চিঠি আমরা পেয়েছি। এখন দেনা-পাওনার ব্যাপারটা মিটলেই তো আমরা এগোতে পারি।

—ঠিক বলেছেন, জবাব দেন মজুমদার সাহেব, ঐ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার দায়িত্ব তো এখন আপনাদের।

—তা' ঠিক, বলে ওঠেন পরেশ। সেই মুহূর্তে পণের টাকাটার প্রসঙ্গ তুলতে যান তিনি। কিন্তু তার আগেই প্রতিমা মজুমদার সাহেবকে খুশি করার চেষ্টায় বললেন, সত্যি বলতে কি, আপনার মত ব্যক্তির পরিবারে আমাদের মেয়েকে দিতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করবো।

একটু সলজ্জ হেসে মজুমদার সাহেব বললেন, না—না, আমি আর এমন কি লোক? তবে হ্যাঁ, সেই যখন বিলিতি কোম্পানির অফিসার ছিলাম তখন এই কলকাতার তা-বড়, তা-বড় লোকেরা এসে ভিড় করতো আমার কাছে। সেদিন তো আর নেই। কথার শেষে একটা আক্ষেপের নিঃশ্বাস ছাড়েন তিনি।

স্ত্রীর দেখাদেখি পরেশও এবার চেষ্টা করেন মজুমদার সাহেবকে খুশি করতে। বললেন, তা' আপনি যা-ই বলুন, মরা হাতি লাখ টাকা।

এবার আর কোন জবাব না দিয়ে প্রশংসাটুকু কেবলমাত্র উপভোগ করতে থাকেন মজুমদার সাহেব।

সাবিত্রী এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। এবার তিনি তাড়া দেন নিজের স্বামীকে, দেখাশোনার পাট যখন শেষ হয়েছে তখন দেনা-পাওনার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে পাকা করে ফেল। আমার তো ইচ্ছে সামনের অগ্রহায়ণেই শুভকাজটা সেরে ফেলি।

—যা বলেছেন, সাবিত্রীকে সমর্থন করেন প্রতিমা। গম্ভীর কণ্ঠে মজুমদার

সাহেব বললেন, আমার আর নতুন করে বলার ক। আছে। আমার কথা তো আমি ওঁদের চিঠিতেই জানিয়েছি।

—তা' অবশ্য জানিয়েছেন, বলে ওঠেন প্রতিমা, তবে—।

স্ত্রীর কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরেশ বললেন, সোনাদানা যা চেয়েছেন তা' না হয় দেয়া যাবে, কিন্তু ঐ পণের টাকাটা—। ইঙ্গিতে কথাটা শেষ করেন তিনি।

—পণ? পণ আবার কিসের? বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, আমি তো কেবল বৌ-ভাতের খরচের একটা অংশ আপনাকে বহন করতে বলেছি।

—ঐ এক কথাই হলো।

—না, এক কথা হলো না, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠেন মজুমদার সাহেব, মুড়ি আর চালভাজা এক বস্তু নয়।

মজুমদার সাহেবের কথার ধরনে শঙ্কিত বোধ করেন প্রতিমা। দু'জনেব কথা কাটাকাটি শেষে ঝগড়ার পর্যায়ে গিয়ে না পৌছয়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজের স্বামীর প্রসঙ্গে বললেন, মেয়ের বিয়েতে উনি যথেষ্ট খরচই করবেন। কিন্তু ঐ নগদ টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারেই ওঁর যা কিছু আপত্তি।

সাবিত্রী বিব্রত দৃষ্টিতে তাঁর স্বামীর দিকে তাকান। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দেন মজুমদার সাহেব, ওনার আপত্তিতে তো আমার চলবে না। আমার দাবী আপনাদের মানতেই হবে।

উপস্থিত পুরুষ দু'জন সম্পূর্ণ দুই মেরুতে। একজন নগদ নিতে বদ্ধপরিকর, অন্যজন নগদ দিতে রাজি নয় কিছুতেই। এদিকে এই বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর মায়েরা খুবই আগ্রহী। তাই প্রতিমা আবার সাবিত্রীকে বললেন, এভাবে তো সমস্যার সমাধান হবে না, দিদি। আমি বলি কি, দু'জনেই কিছু কিছু ছাড়ুন। বৌ-ভাতের একটা অংশ বহন করতে আমি ওঁকে রাজি করাবো। আপনি ওনাকে বলুন টাকার অঙ্ক কিছু কমাতে।

—কত কম ভাই? সাবিত্রী জিজ্ঞেস করেন।

জবাব দেন প্রতিমা, এই ধরুন হাজার দশেক। কথার শেষে প্রতিমা চোখের ইঙ্গিতে পরেশকে বোঝাতে চান যে এনিয়ে বাড়াবাড়ি করে এমন ভালো সম্বন্ধটা তুমি হাতছাড়া করো না।

প্রতিমার প্রস্তাবে সাবিত্রীও খুশি। কিন্তু মজুমদার সাহেব তো আর পরেশ রায় নন। তাই চোখের দৃষ্টিতে আবেদন ফুটিয়ে সাবিত্রী কেবল তাকান মজুমদার সাহেবের দিকে। ভাবখানা যেন—রাজি হয়ে যাও।

—তুমি চুপ্ করো তো, এতগুলো লোকের সামনে স্ত্রীকে ধমকে ওঠেন মজুমদার সাহেব, যা বোঝ না, তা' নিয়ে কথা বলো না। আমি এক কথার মানুষ। যা বলেছি তার একটি পয়সা কমেও হবে না।

একটু থেমে মজুমদার সাহেব এবার সরাসরি পরেশকে বললেন, শুনুন রায়মশাই, আমারও মেয়ে আছে। তারও বিয়ে দিয়েছি। নিজের মেয়ের বিয়েতে ছেলের বাপ যেমনি আমার দিকে তাকায়নি, তেমনি আপনার দিকেও আমি তাকাতে পারবো না। এই আমার শেষ কথা।

--আপনার মেয়ের বিয়ের শোধ কি আপনি আমার ওপর তুলতে চান ?

—ধরে নিন্ তাই। স্পষ্ট কণ্ঠস্বর মজুমদার সাহেবের।

—তা'হলে বলবো এটা ঠিক নয়, জবাব দেন পরেশ, আপনার মেয়ের শ্বশুরের অপরাধে আমি তো শাস্তি পেতে পারি না।

আবার দপ্ করে জ্বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব। চড়া সুরে বলতে থাকেন, শাস্তি ? এটাকে আপনি শাস্তি মনে করছেন ? বেশ তো, কে আপনাদের শাস্তি পেতে ডাকছে ? স্পষ্ট কথা আমার, যা বলেছি তার একটি পয়সা কমেও আপনি আমার ছেলেকে জামাই করতে পারবেন না। ক্ষমতা না থাকে তো অল্প পয়সায় যেখানে পাবেন সেখানে যান। ঘাটে-পথে ছেলের তো অভাব নেই।

মজুমদার সাহেবের কথায় রাগে, দুঃখে, অপমানে মুখখানা লাল হয়ে ওঠে পরেশের। এ কেমন ছোটলোকের মত কথা ? পাত্রীর বাবা বলে কি এমন যাচ্ছেতাই অপমান সহ্য করতে হবে ? এজন্যে সেই মুহূর্তে ঐ লোকটার চাইতে নিজের স্ত্রীর ওপরেই বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পরেশ। প্রতিমার কথায় তিনি যদি এখানে না আসতেন তা'হলে তাকে এমনি অপমান সহ্য করতে হতো না।

স্বামীর কাছে ধমক খেয়ে সাবিত্রী আগেই উঠে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। বিবাদমান দু'টি মানুষের সামনে সেইমুহূর্তে কেবল অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকেন প্রতিমা। তিনি ততক্ষণে বুঝে ফেলেছেন, এরপরে এই বাড়িতে তার কন্যার শুভাগমনের কোন আশাই আর নেই।

অপমানিত পরেশের কণ্ঠস্বরও তখন তীক্ষ্ণ। শুভকাজের আশায় যখন ছাই পড়েছে তখন আর খাতির কিসের ? 'সাহেব' থেকে হঠাৎ তিনি 'মশাইতে' নেমে এলেন। চড়া সুরে বললেন, এ আপনি কী ধরনের কথা বলছেন, মজুমদার মশাই।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন মজুমদাব সাহেব, বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র দরাদরির মত বিয়ের খরচ-খরচা নিয়ে যারা দরাদরি করে তাদের এ ধরনের

কথাই শুনতে হয়, বুঝলেন ?

নিজেকে আর সামলাতে পারেন না পরেশ। বলে ওঠেন তিনি, আর-যারা বে-আইনীভাবে পাত্রীর বাপের পয়সায় বৌ-ভাত সারতে চায় তা'দের কী শুনতে হয় ? জানেন তো, বিয়েতে পণ নেয়া বে-আইনী ?

—আমাকে আইন শেখাতে এসেছেন ? গর্জে ওঠেন মজুমদার সাহেব।

—শেখাতে নয়, মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। এতে আপনার শাস্তি হতে পারে, জানেন ?

কথার শেষে উঠে দাঁড়ান পরেশ। জ্বলন্ত চোখে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, চলো এখান থেকে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না।

মজুমদার সাহেবও সেই সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। কথার জের টেনে বললেন, শাস্তি ? শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে ? বেশ তো, যান না আদালতে। দিন না আমাকে শাস্তি।

—হ্যাঁ, তাই দেব। কথার শেষে মজুমদার সাহেবের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান পরেশ ও প্রতিমা।

আট

পরিতোষের এতদিনের প্রচেষ্টা ও কৌশল সম্পূর্ণ বিফলে গেল। রীনা ও মায়ার সমস্ত আগ্রহ জলের ঝাপটায় নিভে গেল। আর জয়ন্তী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নিলে নিজের মধ্যে শামুকের মত। নিজে থেকে তো নয়ই, এমন কি রীনা, মায়ার অনুরোধেও এখানকার সব খবর জানিয়ে দিল্লীতে কোন চিঠি লিখলে না। তাই বলে কিন্তু যথাসময় সবকিছু জানতে পারলে সঞ্জয়। পরিতোষই চিঠি দিয়েছিল তাকে। জবাবে সঞ্জয় কেবল লিখেছিল, জানো ছোট মামা, ট্রেনিং তো নয়, যেন রিগোরাস ইম্প্রিজনমেণ্টে আছি আমি। রাতদিন কেবল লেক্‌চার, সেমিনার, লেখাপড়া, পরীক্ষা ইত্যাদি। হস্টেলের বাইরে পা দিতে পর্যন্ত সময় পাই না। জয়ন্তীর বিষয়ে কেবল লিখলে, ও ব্যাপারে আমি আর কা বলবো, বলো ? তোমরা যা ভালো বুঝবে করবে।

সঞ্জয় তো সবকিছু তার ছোট মামার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলো, কিন্তু তার সেই ছোট মামা এখন কী করে ? বিষয়টাকে এই পর্যায়ে টেনে আনতে তাকে যথেষ্টই বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছিল। কিন্তু এমন পাকা ঘুঁটি যে শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে কেঁচে যাবে তা' সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে জয়ন্তীর পক্ষে মজুমদার সাহেবের পুত্রবধূ হওয়া আর

কোন কালেই সম্ভব নয়। সঞ্জয় যদি জেদের বশে জয়ন্তীকে বিয়েও করে, তা'হলেও জয়ন্তী কোনদিনই আর মজুমদার সাহেবের বাড়িতে তাঁর পুত্রবধূ হতে পারবে না। আর সেই চেষ্টা করার মত সাহস সঞ্জয়ের আছে বলেও মনে হয় না।

এখন তবে উপায়? নিজের একমাত্র ভাগ্নের বিয়ের ব্যাপারে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে কেমন করে বসে থাকে পরিতোষ? উপায় একটা বের করতেই হবে। এ নিয়ে বনানীও নিয়মিত খুঁচিয়ে চলেছে তাকে। বলছে, রাস্তা একটা বের করতেই হবে তোমাকে। রাজনীতিব মত বিয়ের ব্যাপারেও শেষ কথা বলে কিছু নেই। সেই আশা নিয়েই রীনা ও মায়াকে নিয়ে পরিতোষ দু'দুটো দিন আলোচনায় বসেছে। মজুমদাব সাহেব ও পবেশ রায়েব মধ্যের ছিন্ন সুতো জোড়া লাগাবার উপায় উদ্ভাবনে নানা ধরনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছে। মোটামুটি একটা উপায় মাথায়ও এসেছে পরিতোষের। সেই উপায় নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে পরিতোষ যখন রীনা ও মায়ায় সহায়তায় তৈরি হচ্ছিল, ঠিক তখনই সেই ভয়ঙ্কর খববটা কানে এসে তার প্ল্যানকে আবার অগাধ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মজুমদার সাহেবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পরেশ রায় তাঁর নামে এন্টি-ডাউরি এ্যাক্টে আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছে। দ্বিতীয় বাছাই পাত্রীদের জন্মছক পণ্ডিতমশায়ের কাছে পাঠাবার জন্যে যখন তিনি তৈরি হচ্ছিলেন তখনই তাঁর হাতে এলো আদালতে হাজির হবার সমন।

কঠিন মানুষই বলতে হয় পরেশ রায়কে। আসলে চেষ্টা করেও সেদিনের অপমানেব কথা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। প্রতিমার উপদেশেও তিনি কান দিচ্ছিলেন না। একটি মাত্র চিন্তাতেই কেবল পেয়ে বসেছিল তাঁকে—কেমন করে তিনি শায়েস্তা করবেন ঐ মানুষটাকে? কাগজপত্রে এন্টি-ডাউরি এ্যাক্টের কথা শুনেছিলেন তিনি। কিন্তু এ নিয়ে কোথাও কোন মামলা হয়েছিল বলে শোনেন নি। ভেবেছিলেন, এদেশের অনেক আইনের মত এটাও কেবল কাগজে-কলমেই।

বিষয়টি যাচাই করতে তিনি একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাইপোর, সমরের কাছে। সমর পুলিশ বিভাগে মোটামুটি একটা ভাল পদে চাকরি করে। করিৎকর্মা ছেলে। অল্পদিনেই ডিপার্টমেন্টে বেশ নাম কিনেছে। সব শুনে সমর খানিকটা হতাশার সুরে বললে, কি আর করবেন, কাকা? যে দেশে আমরা জন্মেছি সেই দেশে পাত্রীর বাবাদের এমনি হেনস্থাই সহ্য করতে হয়।

—কেন সহ্য করবে? উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ বললেন, তোমরা তা'হলে আছো কেন?

—আমরা ? মৃদু হেসে একটু আমতা-আমতা করে জবাব দেয় সমর, আমাদের ডিপার্টমেণ্ট এসব ব্যাপারে আর কী স্টেপ নিতে পারে ?

—কেন ? কেন পারে না ? এণ্টি-ডাউরি এ্যাক্ট নামে একটা আইন দেশে চালু আছে না ?

—ও—এই কথা ? আবার একটু হেসে বলতে থাকে সমর, তা' ঠিক। ঐ আইন দেশে চালু আছে বটে। তবে সেটা তো পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ নয়। আমরা ঐ আইনে কিছুই করতে পারি না।

—তা'হলে কি তুমি বলতে চাও ঐ আইনে কোন মামলা করা যায় না ?

—অবশ্যই যায়, জবাব দেয় সমর, সরাসরি আদালতে গিয়ে আপনাকে মামলা করতে হবে।

সমরের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত সেই মামলার পথই বেছে নিলেন পরেশ। শায়েস্তা করতেই হবে পাত্রের বাবা নামক ঐ রাঘব বোয়ালকে।

মুখের জোরের সঙ্গে মনের জোরের বিস্তর ফারাক মজুমদার সাহেবের। কোর্ট-কাছারিকে তাঁর চিরকালের ভয়। তাও আবার বাদী অর্থাৎ অভিযোগকারী হিসেবে নয়, আসামী অর্থাৎ অভিযুক্ত হিসেবে। বলির পাঁঠার মত আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁকে। ব্যাপারটা কেবলমাত্র চিন্তা করলেই মজুমদার সাহেবের হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে ওঠে।

নাওয়া-খাওয়া একরকম ভুলে গেলেন মজুমদার সাহেব। সঞ্জয়ের জন্যে নতুন পাত্রী বাছাই তাঁর মাথায় উঠলো। থেকে থেকেই দেয়াল-ক্যালেণ্ডারের পাতায় আদালতে হাজির হবার তারিখটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে পরেশ রায়ের মুণ্ডুপাত করেন। লোকটা শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই তাঁকে এমন বিপাকে ফেললো !

খবর পেয়ে পরিবার পরিজনদের মধ্যে অনেকেই এলো মজুমদার সাহেবের বাড়ি। এলো পরিতোষ ও বনানী। একরোখা মানুষ হলেও ভগ্নিপতির এমন বিপদে অন্ততঃ সমবেদনা জানাতেও তো আসতেই হয়। কথায় কথায় একজন বয়স্ক আত্মীয় মজুমদার সাহেবের প্রশংসা করে বললেন, ভাগ্যিস তুমি ঐ লোকটার মেয়েকে ঘরে আনো নি। যার বাপের স্বভাব এমনি সেই মেয়ে ঘরে এলে ভবিষ্যতে তোমাকে আরও ক'টা মামলায় জড়াতো কে জানে ? কথাটা শুনে পরিতোষ মন্তব্য করে, ঐ মেয়ে ঘরে এলে কি আর জামাইবাবুকে এ মামলায় জড়াতে হতো ?

পরিতোষ এখন সিরিয়াস। সে বুঝে নিয়েছে জয়ন্তীর আর এই বাড়িতে আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এখন যে কোরে হোক্ জামাইবাবুকে এই

মামলা থেকে রেহাই পেতে হবে। সঞ্জয়ের জন্যে পাত্রীর ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে, কিন্তু মামলার ভাবনা ভাবতে হবে এখনই।

স্বামীর এই বিপদে চিন্তিত সাবিত্রীও। কিসের থেকে কি হয়ে গেল। জয়ন্তীকে তাঁর দারুণ পছন্দ হয়েছিল। কেবলমাত্র চেহারাই নয়, কিরকম এক আকর্ষণ শক্তি যেন সাবিত্রীকে টানছিল জয়ন্তীর দিকে। তিনি মনে-প্রাণে এই মেয়েটিকেই ঘরে আনতে চাইছিলেন। সে সব তো চুকে গেলই, মাঝখান থেকে তাঁর স্বামীর মত একজন মানী লোকের এমনি মানহানি। মুখে না বলেও সাবিত্রীর কাছে এজন্যে মজুমদার সাহেব নিজেও কম দায়ি নয়। কি দরকার ছিল এভাবে ঝগড়া ঝাঁটি করার? মেয়ের মা তো তাঁর স্বামীকে নগদ পনেরো হাজারে প্রায় রাজি করিয়েই ফেলেছিলেন। তোমার সেই পঁচিশ হাজারের জেদ ধরে না রাখলে তো ঐ মেয়েই এ বাড়িতে আসতো, আর তোমাকেও এমন একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়তে হতো না। শেষ পর্যন্ত নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করে চুপ করে থাকার চেষ্টা করলেও মানসিক উদ্বেগের হাত থেকে রেহাই পান না সাবিত্রী। পরিতোষকে দেখে বলেই ফেলেন, ও-পরি, এখন কি হবে বল্ তো? তোর জামাইবাবু সেই থেকে যেভাবে গুম হয়ে আছেন তাতে তো আমার ভয় হয়।

—তুমি কিছু ভেবনা বড়দি, দিদিকে আশ্বাস দেয় পরিতোষ, সেদিন তো উকিলের কাছে জামাইবাবুকে নিয়ে আমিও গিয়েছিলাম। উকিলবাবু তো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, কোন চিন্তা নেই। আদালতে এ ধরনের মামলা প্রমাণ করা নাকি ভীষণ কঠিন। কাজেই ভাবনার কিছু নেই।

—কি জানি, বললেন সাবিত্রী, যা ভালো বুঝিস কর্। আমি তো আর ভাবতেই পারছিনা।

—সঞ্জয়কে ব্যাপারটা জানিয়েছ তুমি? জিজ্ঞেস করে পরিতোষ।

জবাব দেন সাবিত্রী, দূর দেশে ছেলেটাকে এসব কেলেঙ্কারির ব্যাপার জানিয়ে কিই বা হবে? মাঝখান থেকে কেবল তার উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলা। তাই কিছু জানাইনি এখনও।

পরিতোষ আবার বললে, ঠিক্ আছে, তোমাকে কিছু জানাতে হবে না, বড়দি? যা জানাবার আমিই জানাবো।

জানিয়েছিল পরিতোষ। তার জামাইবাবুর জেদ্ ও পরেশ রায়ের গোঁয়ার্তুমি ইত্যাদি কথা মোটামুটি সবিস্তারেই সে জানিয়েছিল সঞ্জয়কে। মাত্র দু'চার লাইনে জবাব সারতে গিয়ে সঞ্জয় লিখেছিল—দেখছি, সমানে সমানে লড়াই শুরু হয়েছে। এই রাজায় রাজায় যুদ্ধের মধ্যে জয়ন্তী বোধহয়

উলুখাগড়া। নেহাত আমি দূরে আছি তাই কিছু টের পাচ্ছি না। তবে বাবার বোধহয় এরকম একটা ধাক্কার প্রয়োজন ছিল।

চিঠিখানা বনানীকে পড়তে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল পরিতোষ, কি বুঝলে?

আরও দু' তিনবার চিঠিখানা পড়ে মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল বনানী, বুঝলাম মাত্র এটুকুই যে তোমার ভাগ্নেটিকে যত সাদাসিধে মনে করো আসলে সে তা নয়। খুবই বুদ্ধিমান।

লোকে লোকারণ্য আদালত কক্ষ। আসামীর কাঠগড়ায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে মজুমদাব সাহেব লক্ষ্য করছিলেন, দর্শকরা যেমনি খাঁচায় আবদ্ধ চিড়িয়াখানার জীবের দিকে হাসিমুখে তাকায়, আদালতের দর্শকরাও তেমনি মুখে হাসি ও মনে কৌতূহল নিয়ে দেখছিল তাঁকে। অবশ্য এজন্যে তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। বিবাহ-সংক্রান্ত মামলা আদালতে এলেও যৌতুক গ্রহণের মামলা প্রায় শোনাই যায় না। বিশেষ করে এ রাজ্যে এজাতীয় মামলা বোধহয় এই প্রথম। পুত্রকে বাসর ঘরে পাঠাতে গিয়ে বাপ প্রায় শ্রীঘরে। আদালত কক্ষের সেই ভিড়ের মধ্যে খবরের কাগজের একজন রিপোর্টারকেও লক্ষ্য করছিলেন মজুমদার সাহেব। অভিনব এই মামলার কার্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করছিল সে। তার অর্থ, পরের দিন সকালেই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মামলার বিবরণী ছাপা হবে নামধাম সমেত এবং টিকা-টিপ্পনি সহযোগে।

কাঠগডায় দাঁড়িয়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল মজুমদার সাহেবের। সেই সঙ্গে মামলার ফলাফল নিয়ে প্রচণ্ড এক অস্বস্তি। তাঁর উকিলবাবু কিন্তু সেই পুরানো আশ্বাসই দিয়েছিলেন তাঁকে, আপনার কোন চিন্তা নেই, মিস্টার মজুমদার? এ মামলা প্রমাণ করা এত সোজা নয়। কিন্তু অপরপক্ষের উকিলের হাতে যে তখন তুরুপেব তাসটি ছিল তা তাঁদের জানা ছিল না।

রীতি অনুযায়ী আসামী মজুমদার সাহেবের বিরুদ্ধে চার্জ-গঠনের আগে বিচারক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি দোষী, না নির্দোষ?

জবাবে একটা ঢোক গিলে নিজের উকিলের নির্দেশমত মজুমদার-সাহেব জবাব দেন, আমি নির্দোষ।

—আপনি তা'হলে পাত্রীর বাবার কাছে কোন পণ বা যৌতুক দাবী করেননি?

--আজ্ঞে না।

--জানেন তো, ছেলের বিয়েতে ছেলের বাপ কিম্বা অন্য কেউ যদি মেয়ের বাপ কিম্বা অন্য কারুর কাছে পণ হিসেবে টাকাকড়ি কিম্বা যৌতুকাদি দাবী করে

তবে তা' এন্টি-ডাউরি এ্যাক্ট অনুযায়া দণ্ডযোগ্য অপরাধ ?

—আজ্ঞে জানি।

—তাহলে আপনি বলতে চাইছেন এই মামলার বাদী পরেশ রায়ের কাছে আপনি তেমন কিছুই দাবী করেন নি ?

—আজ্ঞে না।

এবার আদালতের সামনে পেশ করা হলো সেই তুরুপের তাস। অপর পক্ষের উকিলের পেশ করা তুরুপের তাস অর্থাৎ একখানা চিঠি বিচারক, মজুমদার সাহেবের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, দেখুন তো, পরেশ রায়কে লেখা এই চিঠিটা আপনার কিনা ?

চিঠিখানার দিকে একনজর তাকিয়েই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে মজুমদার সাহেবের। এই চিঠির কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে তিনি নিজেকে বিশ্বের একনম্বর বোকা বলে ভাবছিলেন। ছি—ছি, কোন্ বুদ্ধিতে সেদিন তিনি এমন একটা কাঁচা কাজ করে বসেছিলেন ? তখন কেন তাঁর মনে হয়নি সেই আপ্তবাক্য—শতংবদ, মা লিখ ? নিজের হাতে চিঠি লিখে এভাবে পণ-যৌতুক দাবী করা যে বিপদজনক তা' কেন একবারও তাঁর মনে হয়নি ? বুদ্ধির দোষে সেই বিপদজনক কাজ করেই এখন তিনি অগাধ সলিলে। ...এ থেকে তাঁকে উদ্ধার করার ক্ষমতা কোন উকিল ব্যারিস্টারেরই নেই।

মজুমদার সাহেবকে চুপ্ করে থাকতে দেখে বিচারক আবার জিজ্ঞেস করেন, চুপ করে রইলেন কেন ? জবাব দিন। বলুন এই লেখা আপনার কিনা ?

জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা মুখে আসে না মজুমদার সাহেবের। তা'ছাড়া নিজের হাতে লেখা চিঠি নিজের নয় বললেই কি আদালত তাঁকে রেহাই দেবে ? তা'হলে আর দেশে হাতের-লেখা-বিশারদরা আছেন কেন ? তাই তিনি শেষ পর্যন্ত সত্যি কথাই বলে ফেললেন। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই চিঠি আমিই লিখেছিলাম।

বিচারক আবার বললেন, তা' হলে এবার আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি বাদী পরেশ রায়কে নিজের হাতে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে আপনি রাজি যদি পরেশ রায় যৌতুক হিসেবে পনের-ষোল ভরি সোনার গহনা এবং পণ হিসাবে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে রাজি থাকেন, কেমন ?

এতক্ষণে মজুমদার সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, না, টাকাটা ঠিক্ পণ হিসেবে নয়, বৌ-ভাতের খরচের একটা অংশ হিসেবে মাত্র চেয়েছিলাম।

—চুপ্ করুন, মজুমদার সাহেবকে ধমকে ওঠেন বিচারক, নগদ পণ ও বৌ-ভাতের খরচের মধ্যে কি তফাৎ, তা আমাদের অজানা নয়।

ধমক্ খেয়ে চুপ্‌সে যান মজুমদার সাহেব। গোটা আদালত কক্ষে জেগে ওঠে মৃদু হাসির শব্দ। পণের টাকা চাইতে গিয়ে একটি লোক যে ফাঁদে পড়েছে তাতে আদালতের দর্শকরা বেজায় খুশি। হাসির সেই শব্দ কানে যেতেই সেই মুহূর্তে একমাত্র মা-ধরিত্রীকে দ্বিধা হবার জন্যে আর্জি জানানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না মজুমদার সাহেবের। ছি-ছি, কি লজ্জা! এর চাইতে হার্ট-এ্যাটাক্ কিম্বা ঐ জাতীয় কোন রোগে হঠাৎ মৃত্যু হওয়াও যে ঢের ভালো ছিল তাঁর।

মাথা নিচু করে চুপ্ করে থাকেন মজুমদার সাহেব। তাঁর উকিল ভদ্রলোকের মুখেও আর কথা নেই। মামলার ফলাফল সম্পর্কে তিনি তখন নিঃসন্দেহ। যাকে বলে হাতে-নাতে প্রমাণ। এর বিরুদ্ধে আরগুমেণ্ট করতে চেষ্টা করা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল। শাস্তি অবধারিত। এখন আদালতের কাছে আর্জি জানিয়ে সেই শাস্তি যথাসম্ভব লঘু করার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অবশেষে মজুমদার সাহেবের উকিল তাই করলেন। দয়া প্রার্থনা করলেন আদালতের কাছে। আদালতও সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে পাঁচশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড দিলেন মজুমদার সাহেবকে। মজুমদার সাহেবও কাল বিলম্ব না করে জরিমানার টাকা আদালতে জমা দিয়ে বাইরে এসে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন। বলা তো যায় না কোথায় কোন্ খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার ঘাপটি মেরে বসে আছে।

আদালত থেকে সোজা সেই যে বাড়ি এসে ঢুকলেন মজুমদার সাহেব, আর বাইরে বের হন না তিনি। লজ্জায়, দুঃখে মরমে মরে রইলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর চড়া মেজাজ নরম হলো না একটুকুও। বাড়ির চাকর-বাকর অযথা ধমক্ খেয়ে মরে তাঁর কাছে যেন তাঁর এই লজ্জা অপমানের জন্যে তারাই দায়ী।

মজুমদার সাহেবকে একদিন অপেক্ষাকৃত নরম মুডে পেয়ে সাবিত্রী বললেন, যা হবার তা'তো হয়েই গেছে। এবার ছেলের জন্যে আর একটি পাত্রীর সন্ধান করো।

মজুমদার সাহেব কোন জবাব দেন না। সাবিত্রী এবার অনেকটা আপন মনেই বলতে থাকেন, সেই পাত্রীটি কিন্তু সত্যিই খুব ভালো ছিল। যেমনি দেখতে-শুনতে তেমনি—।

কথাটা শেষ করতে পারেন না সাবিত্রী। তার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠেন মজুমদার সাহেব, চুপ্ করো তো। ঐ মেয়েটার প্রসঙ্গ আর তুলবে না আমার

কাছে। এতবড় অপমান! ইচ্ছে করে ঐ পরেশ রায় লোকটার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে ওকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ি।

—না-না, জামাইবাবু, ওসব করতে যাবেন না। ওতে বিপদ আছে। কথাটা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে পরিতোষ।

শ্যালকের কথায় মজুমদার সাহেব তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বিপদ? কিসের আবার বিপদ?

—গুণ্ডা-বদমাশ দিয়ে কাউকে শায়েস্তা করতে গেলে একদিন ওরাই আবার আপনার ঘাড়ে চেপে বসবে। তা'ছাড়া—।

—তা'ছাড়া কি?

—তা'ছাড়া, শুনলাম ঐ পরেশ রায়ের কোন্ এক আত্মীয় নাকি একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। গুণ্ডা লাগালে সে অবশ্যই তা' জানতে পারবে। তখন আবার এক নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়বেন আপনি।

একটু চিন্তা করে মজুমদার সাহেব বললেন, হ্যাঁ,-এবার বুঝতে পেরেছি। এই মামলা-মোকর্দ্দমার বুদ্ধি বোধহয় সেই পুলিশ অফিসারই ঐ লোকটাকে দিয়েছিল।

—অসম্ভব নয়। কথাটা বলে পরিতোষ থামতেই সাবিত্রী তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ করে ভাইকে বললেন, দ্যাখ, পরি, তোর জামাইবাবুকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে যা। মামলায় হেরে যাবার পর থেকে উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা কেবল ওঁর মাথায় ঘুরছে। কখনও বলেন গুণ্ডা লাগাবো, কখনও বলেন, মানহানির মামলা করবো। ঐ পরেশ রায়কে কোন রকমে বিপাকে ফেলতে না পারলে কিছুতেই উনি স্বস্তি পাচ্ছেন না।

—তাই নাকি জামাইবাবু?

কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে পরিতোষ একটু মুচকি হাসলেও পরেশ রায়কে বিপাকে ফেলার কথা তার মাথায়ও ঘোরাফেরা করছিল। আর, এর পেছনে কাজ করছিল জয়ন্তীকে নিয়ে তার চিন্তা। জয়ন্তী নিজে পরিতোষের বাড়িতে আর না এলেও তার খবরাখবর পরিতোষ নিয়মিতই পেত রীনার মারফত। দেনা-পাওনা নিয়ে ঝগড়ার পরেও রীনার মনে একটা ক্ষীণ আশা তখনও জেগেছিল। ভেবেছিল, পরিতোষের মধ্যস্থতায় একটা কিছু শেষ পর্যন্ত হবেই। মুহ্যমান জয়ন্তীর মনেও সেই আশাই জাগিয়ে রেখেছিল রীনা। কিন্তু মামলা-মোকর্দ্দমা, কোর্ট-কাছারি ও তার পরিণতিতে মজুমদার সাহেবের অর্থদণ্ডের পরে সেই শেষ আশাটুকুও কর্পূরের মত উড়ে গেল রীনার মন থেকে। আর জয়ন্তী নিজে একেবারেই ভেঙে পড়লে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বাড়িতে তাকে স্বাভাবিক থাকার ভান করতে হয় যা নাকি বাস্তবিকই কঠিন। মনের মধ্যে ঝড় আর

বাইরে প্রশান্তির ক্লান্তিকর অভিনয়। এই দু'য়ের মধ্যে পড়ে এক কঠিন অবস্থা জয়ন্তীর। আর বান্ধবীর দুঃখে অমন ছট্‌ফটে, হাসিখুশি রীনার মুখখানাও গম্ভীর। সেই জয়ন্তীর কথা চিন্তা করেই সেদিন একটা মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে পরিতোষ এসেছিল তার দিদির বাড়ি।

পরিতোষের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবল গুম্‌ হয়ে বসে থাকেন মজুমদার সাহেব।

সাবিত্রী পরিতোষকে আবার বললেন, সবই কপাল। নইলে এমন হবে কেন, বল্‌? বাপ লোকটা যাই হোক না কেন, মেয়েটা তো ভালই ছিল। আর সেই কথা বলতেই তোর জামাইবাবু আমার ওপর ক্ষেপে আগুন।

—না, ক্ষেপবে না! চড়া গলায় স্ত্রীকে বললেন মজুমদার সাহেব, আনন্দে একেবারে গড়াগড়ি খাবে!

এবার পরিতোষ তার দিদির পক্ষ নিয়ে বললে, কেন জামাইবাবু, দিদি তো কিছু মিথ্যা বলেনি। পাত্রীটি যে খুব ভালো তা'তো একদিন আপনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ বলেছিলাম, স্বীকার করেন মজুমদার সাহেব, তখন কি ছাই জানতাম তার ঐ বাপটা একটা—একটা—। জুৎসই একটা বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে শেষে তিনি চুপ্‌ করেন।

ভাইকে কাছে পেয়ে মনে একটু জোর পান সাবিত্রী। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মজুমদার সাহেবকে শুনিয়ে পরিতোষকে বললেন, কথাবার্তা তো ভালই এগোচ্ছিল। কেবল অতগুলো নগদ টাকার জন্যেই তো এমন কাণ্ড ঘটলো। তা'ছাড়া টাকা না হয় চাওয়াই হয়েছিল, কিন্তু একজন ভদ্রলোককে এমনধারা অপমান—

কথাটা শেষ করতে পারেন না সাবিত্রী। তার আগেই গর্জে ওঠেন মজুমদার সাহেব, অপমান? হ্যাঁ স্বীকার করছি, লোকটাকে আমি অপমান করেছি। তোমরা সবাই আমার সেই দোষটাই দেখলে। কিন্তু আমি কি আগে কিছু বলেছি? আমাকে আইনের ভয় দেখাতেই না—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই মজুমদার সাহেব আবার বসে থাকেন গোঁজ হয়ে।

খানিকক্ষণ চুপ্‌ করে থেকে মজুমদার সাহেবকে একটু শান্ত হবার সুযোগ দিয়ে সাবিত্রী আবার বললেন, যাক্‌গে, যা হবার তা' তো হয়েই গেছে। কপালে অপমান ও অর্থদণ্ড ছিল তাই হয়েছে। এবার বরঞ্চ সঞ্জুর জন্যে আর একটি পাত্রীর সন্ধান করো।

—না, আমি পারবো না। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব। তোমরা সবাই মিলে যখন আমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছ তখন সঞ্জুর বিয়ের

ব্যাপারে আমি আর নেই। এই তোমাদের স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি।

—সেকি জামাইবাবু? আপনি হলেন পাত্রর বাবা। আপনিই যদি—।

—ওসব যদি-টদি নয়, গম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন মজুমদার সাহেব, তুমি তো জানো পরিতোষ, তোমার জামাইবাবু ফাঁকা বুলি কপ্‌চায় না। এর মধ্যে থাকবো না বলে যখন একবার ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি তখন এর আর নড়চড় হবে না।

মজুমদার সাহেবের কথায় শঙ্কিত বোধ করেন সাবিত্রী। এই পরিবারে তাঁর স্বামী ছাড়া যে কোন কাজ সম্ভব হতে পারে তা' যেন বিশ্বাস করতেই পারেন না তিনি। তাই সাবিত্রী ম্লান কণ্ঠে বললেন, এসব কি কথা বলছো তুমি? একটা মাত্র ছেলে তোমার। তার বিয়ের ব্যবস্থায় তুমি যদি হাত না লাগাও তা'হলে হয়তো সঞ্জুর আর কোনদিন সংসার করাই হবে না।

—না হলে না হবে। মুক্ত পুরুষের মত উদাসীন কণ্ঠস্বর মজুমদার সাহেবের, তোমরা আর সবাই রয়েছ। তোমরাই দেখাশেনা করে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করো।

পরিতোষ বললে, আমাদের ব্যবস্থা কি আপনার মনোমত হবে, জামাইবাবু? ঐ রাজযোটক, দেনা-পাওনা ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে কি আমরা আপনার মত নজর দিতে পারবো? তাই বলছিলাম, যা হবার হয়েছে। এবার নতুন করে আবার শুরু করুন।

পরিতোষ যতই কেন না অনুরোধ করে, একরোখা চরিত্রের মজুমদার সাহেব কিছুতেই নরম হন না। সাবিত্রী কিন্তু ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে এই মানুষটা একবার যখন 'না' বলেছে তখন তাঁকে 'হ্যাঁ' করানো বাস্তবিকই দুঃসাধ্য। তাই তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, সাধাসাধি করে কোন ফল হবে না রে, পরি।

—তা'হলে কি সঞ্জুর বিয়ের কোন ব্যবস্থা হবে না? সাবিত্রীর দিকে তাকায় পরিতোষ।

এতক্ষণে সাবিত্রী নিজেও খানিকটা শক্ত হয়ে ওঠেন। বললেন পরিতোষকে, কেন হবে না? আমরাই দেখে শুনে পছন্দ করে সঞ্জুর বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করো। বলতে থাকেন মজুমদার সাহেব, বিনে পণে, বিনে যৌতুকে, ঘরের পয়সা খরচ করে ছেলের বিয়ে দাও গে। একবার নিজের হাতে করে দেখ না কত ধানে কত চাল! কোন হা-ভাতের ঘরের এক মরাখেকো পেত্নীকে এনে দাঁড় করাও নিজের ছেলের পাশে।

মজুমদার সাহেবের কথার ঢংয়ে বিরক্তিবোধ করছিলেন সাবিত্রী। নিজের স্বভাববিরুদ্ধ চড়া স্বরে তিনি এবার বললেন, বেশ তো দেখ না, তুমি ছাড়া বিয়ের ব্যবস্থা হয় কিনা?

একটু সময় চুপ করে থেকে সাবিত্রী পরিতোষকে বললেন, শোন পরি। সঞ্জুর জন্যে একটি পাত্রীর খোঁজ কর। ঠিক পরেশ রায়েব মেয়ের মত পাত্রী হওয়া চাই।

—কার্বন কপির কথা বলছো, বড়দি? জবাব দেয় পরিতোষ, ঠিক কার্বন কপি পাওয়া তো কষ্টকর।

কথাটা শেষ কবেই পবিতোষ আড়চোখে একবার তার জামাইবাবুর মুখখানা দেখে নিয়ে এমন একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব কবে বসে যা শুনে মজুমদার সাহেব তো বটেই, এমনকি সাবিত্রী পর্যন্ত চমকে না উঠে পাবেন না। বললে, তবে তোমবা যদি বলো তো ঐ পরেশ বায়ের মেয়ের জন্যেই আবার চেষ্টা কবতে পারি।

—বলছিস কি তুই? কথাটা নিজেব ভাইকে বললেও সাবিত্রী ভয়ে-ভযে তাকান তাঁর স্বামীর দিকে।

যেন কিছুই হয়নি এমনি মুখ করে জবার দেয় পরিতোষ তার বড়দিকে, কেন, তোমরাই তো বলেছ যে ঐ মেয়েটিকে নাকি তোমাদেব খুবই পছন্দ।

কিছু বলার জন্য মুখ তোলেন সাবিত্রী। কিন্তু তার আগেই সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। হুঙ্কাব ছাড়েন মজুমদার সাহেব, কি—কি বললে পবিতোষ? ঐ পাজি লোকটার মেয়ে আমার পুত্রবধূ হয়ে আসবে? এ্যাব্‌সার্ড—ইম্পসেব্‌ল। কক্ষনো নয। আমি বেঁচে থাকতে তা' কিছুতেই হবে না। এতবড অপমান হজম কবে ঐ মেয়েকেই আমি আবার ঘরে আনবো? কভি নেহি।

ইংরেজি-বাংলা-হিন্দীতে কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে দম্‌ নেবার জন্যে একটু থামেন মজুমদার সাহেব। আর সেই ফাঁকে ভগ্নিপতির স্বরে স্বর মিলিয়ে জবাব দেয় পরিতোষ, ঠিকই বলেছেন, জামাইবাবু। কভি নেহি। এমন বিশ্রী অপমান হজম করে ঐ মেয়েকে কিছুতেই এই বাড়িতে নয়। আর যদি ঐ মেয়েকে আনতেই হয় তা'হলে ঐ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবেই তাকে আনতে হবে।

শ্যালকের কথায় একটু থতমত খেয়ে তার মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকেন মজুমদার সাহেব, তারপর বলে ওঠেন, তার মানে! কি বলতে চাইছো তুমি, পরিতোষ?

একান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দেয় পরিতোষ, আমি বলছিলাম কি এভাবে চুপ করে বসে থেকে সেই অপমান হজম করা কিছুতেই চলবে না। কড়ায়- গণ্ডায় সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

—একজাক্টলি। বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব। নিজের মনের কথা

এতদিন পরে পরিতোষের মুখে শুনে মনে মনে খুশি হন তিনি। বললেন, তবে এর মধ্যে ঐ মেয়েটাকে আবার এ বাড়িতে কেন? দেশে পাত্রীর কি অভাব?

একটু সময় চুপ করে থেকে মনে মনে হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, অমি কিন্তু ভাবছি প্রতিশোধ নিতে হবে অন্যভাবে।

—কি ভাবে?

—দেখুন জামাইবাবু, সেই পরেশ রায় আপনাকে নিদারুণ অপমান করেছে। এখন আপনি যদি সেই অপমানের শোধ নেন তা'হলে ব্যাপারটা চুকে-বুকে গেল। আমি কিন্তু তা' চাইছি না। আমি চাইছি এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ঐ লোকটা আমাদের প্রতিশোধের কথা চিরকাল মনে রাখে। আর ঠিক এই জন্যেই চাইছি তার মেয়েকে এই বাড়িতে আনতে।

খানিকক্ষণ চিন্তা করেন মজুমদার সাহেব। তারপর শ্যালকের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন, না পরিতোষ, নিরীহ একটা মেয়েকে এ বাড়িতে এনে তার বাপের দোষে তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করে বাপের ওপর প্রতিশোধ নেবার মত ছোটলোক আমি হতে পারবো না।

এই সময় বলে ওঠেন সাবিত্রী, এ তুই কি বল্‌ছিস, পরি? আমার সঞ্জুর আদরের বৌ। তার ওপর অত্যাচার—।

—কি মুশকিল! জবাব দেয় পরিতোষ, তোমরা আমার কথা একেবারেই বুঝতে পারছো না, বড়দি। তোমার আদরের বৌমা তোমাদের কাছে আদরেই থাকবে। কেবল ঐ পরেশ রায় প্রতিনিয়ত অনুভব করবে সেই প্রতিশোধের জ্বালা। লোকটার সেই মেয়েটিকে তোমাদের মনে ধরেছিল বলেই না তার দিকে এভাবে ঝুঁকেছিলে। নইলে দেশে কি আর মেয়ের অভাব?

পরিতোষের কথাগুলো স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই মনে ধরে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এ বাড়িতে ঐ সর্বসুলক্ষণা পাত্রীটিই বধূ হয়ে আসবে, আবার পরেশ রায়ও টের পাবে প্রতিশোধের জ্বালা—এমন একটা ব্যবস্থা তো অতি চমৎকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এমন একটা পরিকল্পনা কি সম্ভব করে তুলতে পারবে পরিতোষ?

মজুমদার সাহেবের আগে প্রশ্নটা সাবিত্রীই করে বসেন তাঁর ভাইকে। জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে পরি, একাজ তুই করবি কেমন করে? আর এত কাণ্ডের পরে তারাই বা কোন সাহসে তাদের মেয়েকে এই বাড়িতে পাঠাবে?

প্রশ্নের জবাব পেতে সাবিত্রীর মত মজুমদার সাহেবও তাকিয়ে থাকেন পরিতোষের দিকে।

একটু ভেবে মৃদু হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, কি করবো তা' এখনই বলতে পারছি না বড়দি, তবে জামাইবাবু একটু আগে নিজেই মুখে যা বলেছেন তাতে তাঁকে স্থির থাকতে হবে। সঞ্জুর বিয়েতে তাঁর কোন ভূমিকাই থাকবে না। যা করবার আমিই করবো তোমার সঙ্গে যুক্তি করে। কেমন রাজি তো, জামাইবাবু?

—ভালই তো, তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, তোমরা ভাই-বোনে মিলে যদি দায়িত্ব কাঁধে নাও তা'হলে তো আমি বেঁচে যাই। তবে—।

—তবে কি, জামাইবাবু?

গাম্ভীর্যের আডালে নিজের মনোভাব লুকোতে চেষ্টা করে মৃদু কণ্ঠে বললেন মজুমদার সাহেব, তোমার দিদির যখন ঐ পাত্রীটিই পছন্দ তখন—।

—কেবল দিদির কেন, আপনার নিজের পছন্দ নয়? মিটি মিটি হেসে জিজ্ঞেস করে পরিতোষ।

তেমনি ভঙ্গিতেই আবার জবাব দেন মজুমদার সাহেব, না—না, আমি কি কখনও বলেছি যে আমার পছন্দ নয়? তবে হ্যাঁ, পরেশ রায়ের ওপর সেই প্রতিশোধের ব্যাপারটা—।

হালকা ভঙ্গিতে নিজের বুকে টোকা মেরে জবাব দেয় পরিতোষ, জামাইবাবুর শ্যালক পরিতোষ যা বলে তা'হয়তো সবসময় করে উঠতে পারে না। কিন্তু বড়দির ভাই পরিতোষ যা বলে তাই করে, বুঝলেন?

পরিতোষের কথায় স্নেহের হাসি ছড়িয়ে পড়ে সাবিত্রীর মুখে।

নয়

এণ্টি ডাউরি এ্যাক্টে একটি পাত্রের রাঘব বোয়াল বাবাকে ঘায়েল করে প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন পরেশ রায়। বলতে গেলে গোটা পশ্চিমবঙ্গে এধরনের মামলা এই প্রথম, আর এর নায়ক স্বয়ং পরেশ রায়। তবে তিনি যতই বড়মুখ করে এই কাহিনী অন্যকে শোনাতেন বাড়িতে তাঁর স্ত্রী প্রতিমা যেন ততই মুষড়ে পড়তে লাগলেন। প্রতিমার কেবলই আশঙ্কা, এর পরে কোন পাত্রের বাবা কি তাঁদের দিকে এগিয়ে আসবে? এমন কেলেঙ্কারীর ফলে হয়তো জয়ন্তীর আর বিয়েই হবে না। এই মামলা-মোকর্দ্দমায় একমাত্র গায়ের ঝাল মেটানো ছাড়া আর কী লাভ হলো তাঁদের? মাঝখান থেকে অমন একটা সুপাত্র হাতছাড়া হয়ে গেল। মুখে তেমন কিছু না বললেও প্রতিমা এজন্যে দায়ী করেন তাঁর স্বামীকেই। মাত্র তো দশটি হাজার টাকা। পাত্রের বাপ চেয়েছিল পঁচিশ। আর পনেরোতে তো পরেশ রায় প্রায় রাজিই

হয়েছিলেন। মাত্র ঐ দশটি হাজারের জন্যে এমন কাণ্ড করার যে কি অর্থ হলো তা' কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না প্রতিমা। এদিকে জয়ন্তীর হাবভাবও তেমন ভালো ঠেকছিল না তাঁর কাছে। মা হয়েও মেয়ের মনের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। একবার মনে হয় জয়ন্তী যেন উদাসীন নির্বিকার। আবার মনে হয় ওর মনে সর্বদা যেন একটা চাপা দুঃখ। কিন্তু কিসের দুঃখ। আজকালকার কলেজে পড়া মেয়ে। বলা তো যায় না কিছু। হয়তো কোন একটি ছেলেকে মনে মনে পছন্দ করে বসে আছে। তাই হয়তো মা-বাবাব পছন্দ করা পাত্রের ঘবে যেতে হবে বলে এমন দুঃখ। তা বাপু, তেমন কোন ছেলেকে পছন্দ হলে সেকথা মুখ ফুটে বল না। এখনও তো সময় আছে। মামলা-মোকর্দমার মধ্যে সেই বিয়েটা যখন ভেঙেই গেল তখন তোর নিজের পছন্দের কথা বলতে আপত্তি কি? নিজে না বলতে পারিস ঐ রীনাকে দিয়ে জানিয়ে দে না। তাও নয়। কেবল মুখ বুজে থাকা।

সেই কথা জানতেই প্রতিমা একদিন ধরে বসেছিলেন রীনাকে। শুনে, প্রথমে রীনা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। শেষে একটু ম্লান হেসে বলেছিল, না মাসীমা, ওসব কিছু নয়। ওর মত ভালো মেয়ে আমাদের ক্লাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। আসলে এসব মামলা-মোকর্দ্দমাব কেলেঙ্কারীর পবে ওব আর বিয়ের পিঁড়িতে বসতেই ইচ্ছে করছে না।

বলেছিলেন প্রতিমা, তাই বলে রাত-দিন এমন মুখ ভার কবে বসে থাকতে হবে? জানো মা, কতদিন ঐ মেয়েটার মুখে একফোঁটা হাসি দেখিনি। কথা বলতে বলতে চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠেছিল প্রতিমার।

ম্লান স্বরে বলেছিল রীনা, যাই বলুন মাসীমা, মানিকতলার ঐ পাত্রটি কিন্তু ভালোই ছিল।

—হ্যাঁ মা, জবাব দিয়েছিলেন প্রতিমা, কিন্তু ঐ বাপটাই ছিল যত নষ্টের গোড়া। তা'বাপু, অন্যের কথা বলি কেন, তোমার মেসোমশাইয়ের দোষ কি কম? না হয় কিছু বেশি টাকা দাবী করেই ছিল, তাই বলে একেবারে কোর্ট-কাছারি? ছি-ছি, ভাবলেও লজ্জায় মরি।

একটু থেকে প্রতিমা আবার বলেছিলেন, তোমারও তো বাপু কত আত্মীয়-পরিজন আছে। নিজের বন্ধুর জন্যে একটি ভালো পাত্রর খোঁজ করো না, মা।

রীনা সেদিন প্রতিমাকে কোন জবাব না দিলেও দিন কয়েক পরে একদিন পরিতোষের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা এসে হাজির হয় নাকতলায় জয়ন্তীদের বাড়ি।

রীনার ইচ্ছে ছিল সর্বপ্রথম সেকথাটা পাড়ে প্রতিমার কাছে। কিন্তু তার আগেই তাকে ধরে ফেললেন স্বয়ং পরেশ রায়। হালকা সুরে জিজ্ঞেস করেন, কি মা, আজ বুঝি কলেজ নেই?

—না মেসোমশাই, জবাব দেয় রীনা, আজ ছাত্র ধর্মঘট।

—তাই বুঝি? তাই জন্তু আজ কলেজে যায়নি।

—হ্যাঁ মেসোমশাই। ভাবলাম একটা ফালতু ছুটি যখন পেয়েছি তখন জয়ন্তীকে নিয়ে একটা ছবি দেখতে যাবো।

—বেশ তো—ভালোই তো, বলতে থাকেন পরেশ, তোমার মাসীমাও সেদিন বলছিলেন, মেয়েটা ইদানীং কেমন যেন হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রীনা জিজ্ঞেস করে, মাসীমা কোথায়? তাঁর জন্যে একটা খবর এনেছি।

—খবর? কিসের খবর?

—না, তেমন কিছু নয়। সেদিন মাসীমা জয়ন্তীর জন্যে একটি পাত্রর কথা বলেছিলেন। একটি ভালো পাত্রর খোঁজ এনেছি।

—তাই নাকি? কোথাকার পাত্র? কি করে?

রীনা জবাব দেবার আগেই ঘরে ঢোকেন প্রতিমা। বললেন, তাই নাকি মা? একটি ভালো পাত্রর খোঁজ এনেছ?

—হ্যাঁ মাসীমা। তবে পাত্রটি কিন্তু বাঙাল দেশের মানুষ।

—ওসব বাঙাল-ঘটি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, বলে ওঠেন পরেশ, পাত্রটি যদি ভালো হয়, আর পরিবারটা যদি ভদ্র হয় তা'হলেই আমরা খুশি।

জবাব দেয় রীনা, সেদিক থেকে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মেসোমশাই। পাত্রটির মামা আমার এক বান্ধবীর বাবার বন্ধু। ঐ মামার বাড়িতে থেকেই পাত্রর লেখাপড়া। বাবা-মা থাকেন বাংলাদেশে। লেখাপড়ায় নাকি দারুণ মেধাবী। জয়ন্তীর মুখেই বোধহয় শুনেছিলাম, সেই আগের পাত্রটি, যাদের সঙ্গে আপনাদের মামলা-মোকর্দমা হয়েছিল, সেই পাত্রটি নাকি ছিল ফার্স্টক্লাশ ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই পাত্রটিও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। বম্বেতে মোটা মাইনের চাকরি।

রীনার মুখে পাত্রটির পরিচয় শুনতে শুনতে প্রতিমার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরেশ জিজ্ঞেস করেন, পরিবাবটা কি রকম? বাপ আবার সেই মজুমদার ব্যাটার মত রাঘব বোয়াল নয় তো?

—বাপ মা তো এদেশে থাকেই না। মৃদু হেসে রীনা বললে।

—ওহো, আগেই তো তাই বললে, বলতে থাকেন পরেশ রায়, তা'হলে পাত্রটির গার্জেন বলে কেউ নেই? সে নিজেই নিজের গার্জেন?

—না-না, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রীনা, ঐ যে মামা, যার বাড়িতে পাত্র লেখাপড়া করেছে, সে-ই তো পাত্রর গার্জেন।

—আচ্ছা—আচ্ছা। একটু সময় চিন্তা করে পরেশ রায় আবার জিজ্ঞেস করেন, কি নাম সেই মামার? কোথায় থাকেন? কি করেন?

মুখে কোন জবাব না দিয়ে রীনা তার হাতের ব্যাগ খুলে একখানা সুদৃশ্য কার্ড বের করে পরেশের হাতে দিয়ে বললে, আমার সেই বান্ধবীর বাবা দিয়েছেন। বলেছেন ব্যবসায়ী মহলে অনেকেই নাকি এঁকে চেনে।

পরেশ রায় একটু সময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন কার্ডখানির দিকে। নিজের ঠোঁটের ওপর দু'আঙ্গুলের তবলা বাজাবার ভঙ্গির মধ্যে যেন কিছু মনে করতে চেষ্টা করেন। তারপর একসময় অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকেন, পরিতোষ দত্ত—পরিতোষ দত্ত। আয়রণ মার্চেণ্ট। ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্স। হ্যাঁ, ঠিক। এঁর সঙ্গেই যেন একবার কোথায় আমার আলাপ হয়েছিল—। করিৎকর্মা মানুষ।

—এঁকে চেনেন নাকি, মেসোমশাই? সঞ্জয়ের বাবা মজুমদার সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে রীনা।

পরেশ জবাব দেন, না মা, তেমন কোন পরিচয় নয়। ব্যবসায়ী মহলের কোন একটা মিটিংয়ে মনে হয় আলাপ হয়েছিল। যদি সেই ভদ্রলোকই হয়ে থাকেন তা'হলে বলতে হয় দারুণ আমুদে মানুষ।

রীনা প্রায় মুখ ফস্কে বলেই ফেলেছিল যে, মানুষটা সত্যিই আমুদে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যদি মনে করেন তা'হলে একবার যোগাযোগ করে দেখতে পারেন, মেসোমশাই।

—হ্যাঁ তাই করো, স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রতিমা বললেন, সেই আগের পাত্রটির মত, এটিও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। বম্বেতে বড় চাকরি।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে খানিকটা ঠাট্টার স্বরে বললেন পরেশ, তুমি যে দেখছি সেই বাঘব বোয়াল বাপের ছেলেটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছো না।

সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দেন প্রতিমা, না—না, তা নয়। সত্যি বলতে কি, পাত্র হিসেবে সেটি তো ভালই ছিল। কেবল—। কথাটা শেষ না করেই চুপ করেন তিনি।

ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্সে পরিতোষের বাড়িতে এসে পরেশ রায় বুঝতে পারেন অনুমান তাঁর মিথ্যে নয়। পরেশকেও মুখ চেনা বলে মনে হয় পরিতোষের।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই পাত্রর প্রসঙ্গ ওঠে। বলতে থাকে পরিতোষ, দেখুন পরেশবাবু, আমার এই একটি মাত্র ভাগ্নে। আমার জামাইবাবু বিষ্ণুকান্ত দেব নিজের জমিজমা নিয়ে এখনও ওপার বাংলায় পড়ে আছেন। এত করে বলছি, কিছুতেই এপারে আসবেন না। যদি বা দু'দশ দিনের জন্যে আসেন তো ফিরে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠেন। আমার ঐ একমাত্র ভগ্নে সঞ্জয়ের লেখাপড়া বলতে গেলে আমার এখানেই।

—সঞ্জয়! চমকে ওঠেন পরেশ রায়। একবার তাকান স্ত্রী প্রতিমার দিকে।

—হ্যাঁ, সঞ্জয় দেব। বলে ওঠে পরিতোষ, দেখেছেন নাকি তাকে?

—না—না, তাড়াতাড়ি জবাব দেন পরেশ, সে সব কিছু নয়। সঞ্জয় নামে আর একটি পাত্রর ব্যাপারে কথাবার্তা খানিকটা এগিয়েছিল। নানা কারণে শেষ পর্যন্ত তা' আর হয় নি। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই জবাব দিলেন পরেশ। সেই মামলার কথা এঁদের কানে উঠেছিল কিনা কে জানে? উঠলে তো সর্বনাশ!

মনে মনে একটু হেসে স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করে পরিতোষ, তাদের টাইটেলও বুঝি দেব?

—না—না, জবাব দেন পরেশ, তারা মজুমদার। দেব এবং মজুমদার দু'টোই আমাদের পাল্টি ঘর।

কনে দেখার প্রথম পর্বটি উৎরে গেল অনায়াসেই। পরিতোষ ও বনানীর অভিনয় নিখুঁত। জয়ন্তীকে যেন তারা জীবনে এই প্রথম দেখলে। ভয় ছিল খোদ জয়ন্তীকে নিয়েই। তবে কনে দেখার সময়টুকু জয়ন্তীর পাশে বসে তাকে প্রায় গার্ড দিয়ে রেখেছিল রীনা।

কনে দেখার দ্বিতীয় পর্বটিই হয়ে উঠলো বিপদজনক। শঙ্কিত বনানী পরিতোষকে বলেছিল, দেখ, এই রিস্ক্ নেয়াটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। না-ই বা গেল সঞ্জু নিজে কনে দেখতে। জয়ন্তীর মা-বাবার যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় তা'হলে গোটা ব্যাপারটাই মাটি হয়ে যাবে।

চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল পরিতোষ, তুমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। বাবা-মা কাছে নেই। মামা-মামী গার্জেন। সেখানে যদি অন্ততঃ পাত্র নিজে পাত্রীকে না দেখে তা'হলে বিষয়টা একটু বিসদৃশ ঠেকতে পারে জয়ন্তীর মা-বাবার কাছে। তাই আমি ইচ্ছে করেই সঞ্জুকে দু'তিন দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এখানে আসতে লিখেছি।

মহড়া চলছে দুই বাড়িতে। সঞ্জয়ের মহড়ার ভার নিয়েছে তার মামা-মামী। ঘনিষ্ঠতার কথা তো দূরঅস্তু, পারস্পরিক পরিচয়ের সামান্যতম ইঙ্গিতও ফুটে

উঠবে না তাদের আচরণে। আর জয়ন্তীর মহড়ার ভার রীনার হাতে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জয়ন্তীর কানের কাছে রীনার কেবল সেই একটি কথা, এতদিন অদর্শনের পরে লোকটির দিকে যেন আবার ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকিস না। মনে রাখিস, তোর বাবা-মার চোখে ধুলো দিতে এটা স্রেফ অভিনয়।

রীনার এই সাবধান বাণীর প্রয়োজন ছিল না। ঘরের মধ্যে একদল লোকের উপস্থিতিতে বিশেষ করে নিজের মা-বাবার সামনে সঞ্জয়ের দিকে জয়ন্তীর তাকাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একান্ত ব্রীড়া সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো সে। সঞ্জয়ের অবস্থাও সেই মুহূর্তে প্রায় জয়ন্তীরই মত। তবে তার কারণ লজ্জা নয়, ভয়। পাছে পরেশ ব্যাপারটা ধরে ফেলেন সেই ভয়েই সঞ্জয় সারাক্ষণ প্রায় বোবা হয়েই রইলো। পরিতোষের পীড়াপীড়িতে সঞ্জয় একসময় মৃদু কণ্ঠে বললে, আমি আর কি জিজ্ঞেস করবো? যা করার তোমরাই করো। কথার শেষে সঞ্জয় চুপ করতেই হেসে বনানী বললে, আমাদের ভাগ্নেটি বড়ই লাজুক প্রকৃতির।

—তা' যা বলেছেন, রীনা বলে ওঠে এই সময়, এত বেশি লাজুক যে সন্দেহ হচ্ছে আমার বান্ধবীকে ঠিক মত দেখেছেন কিনা।

রীনা থামতেই সঞ্জয় তার মুখে লক্ষ্য করে চাপ কৌতুকের হাসি। ঐ হাসিটুকু দিয়ে রীনা যেন বলতে চাইছে, আহা কি লাজুক রে! একেবারে ভাজা মাছটি পর্যন্ত উল্টে খেতে জানে না।

কনে দেখার পালা শেষ। সঞ্জয়কে দারুণ পছন্দ হয়েছে পরেশ ও প্রতিমার। মামা পরিতোষের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরে প্রতিমা একদিন হেসে হেসে স্বামীকে বললেন, হ্যাঁ, জামাই হতে হয় তো এমনিই হওয়া উচিত। আহা, যেমনি চেহারা, তেমনি মুখখানা যেন পাথরে খোদাই করা। দারুণ মানাবে জতুর সঙ্গে।

—তা' যা বলেছ, জবাব দেন পরেশ, আগের দুই জামাইকে নিয়ে তো তোমার খুঁতখুঁতির অন্ত নেই। সত্যি বলতে কি, তাদের একজনও দেখতে ভালো নয়। এতদিনে তোমার সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষ করে তোমার বোন মনোরমার সুন্দর জামাই আসার পর থেকে তুমি তো প্রায় মরমে মরেছিলে।

—কেবল আমি কেন? বলে ওঠেন প্রতিমা, তুমিও তো বরাবর বলে এসেছ যে তোমার মেয়েদের কাছে জামাইদুটি মোটেই মানানসই হয়নি।

পরেশ চুপ করে থাকেন। প্রতিমা সাবধান করে দেন তার স্বামীকে, দেখ, একটি নিয়ে তো কেলেঙ্কারীর একশেষ। মামলা-মোকর্দমা, কতকিছু। এটির বেলায় যেন তেমন কিছু না ঘটে। এটি হাতছাড়া করা কিছুতেই চলবে না।

দেনা-পাওনার কথায় যা চাইবে তা-ই দিতে হবে।

—যদি সেই মানিকতলার চশমখোর শাইলকের মত বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দাবী করে?

একমুহূর্ত দ্বিধা করেন প্রতিমা। তারপর জবাব দেন, ছেলের গার্জেন বলতে তো এখানে ঐ মামা-মামী। ওঁদের কথা-বার্তায় তো খুব ভালোই মনে হলো। এমন দাবী তাঁরা করবেন বলে তো মনে হয় না। আর যদি করেই বসেন তা'হলে তা' দিতেই হবে। মনোরমা যদি লাখটাকা খরচ করে তার জামাইকে বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারে তা'হলে আমিই বা কিছু বেশি খরচ করতে পারবো না কেন? আমার অবস্থা কি মনোরমার চাইতে খারাপ?

এ কথার আর জবার নেই। সেই মুহূর্তে পরেশ আর কিছু না বললেও নগদ পণের প্রসঙ্গে মনটা তার কঠিন হয়ে ওঠে। ঐ একটিমাত্র দাবী ছাড়া আর সবকিছুই তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত। মানিকতলার পাত্রটির ব্যাপারে অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর অনুরোধে পনেরো হাজারে রাজি হয়েছিলেন তিনি। সেই ব্যাটা রাঘব বোয়ালের অতিরিক্ত লোভই সেদিন বিষয়টিকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিতে বাধ্য করেছিল পরেশকে।

কনে নির্বাচন পর্ব শেষ। সঞ্জয় ফিরে গেছে তার কর্মস্থলে। বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক হবার পরে আবার আসবে। ছোটমামার সঙ্গে তেমনি ব্যবস্থাই তার হয়েছে।

পরিতোষের ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্সের বাড়িতে বিয়ের পাকাপাকি কথাবার্তা বলতে সস্ত্রীক এসে হাজির পরেশ রায়। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পরে একসময় পরেশ বললেন, তা'হলে পরিতোষবাবু, এখন তো কেবল বাকি রইলো দেনা-পাওনার কথাটা। এটা হলেই তো ব্যাপারটা একদম পাকা হয়ে, যায় কি বলেন?

এতদিনে আসল খেলা শুরু করে পরিতোষ। পরেশের মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে অমায়িক হাসি হেসে জবাব দেয়, সেকি! দেনা-পাওনা আবার কিসের? না মশাই, ওসব কথা তুলবেন না আমাদের কাছে। আপনি কেবল আপনার মেয়েকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে দেবেন। আমার ভাগ্নের জন্যে আমি কেবল আপনার মেয়েটিকেই চাইছি। তা'ছাড়া আর কিছু নয়। পাত্রর বাবা অর্থাৎ আমার জামাইবাবুও বাংলাদেশ থেকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন।

পরিতোষের কথায় পরেশ রায়ের মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে মনে বলেন, একেই বলে খাঁটি ভদ্রলোক। একবার তাকান স্ত্রী প্রতিমার দিকে। তারপর পরিতোষকে আবার বললেন, না—না, সেকি কথা? পাত্র

পক্ষের কিছু দাবী-দাওয়া তো অবশ্যই থাকবে। অনেকটা পীড়াপীড়ির ভঙ্গিতেই কথাটা বললেন পরেশ রায়।

জবাবে পরিতোষ তেমনি অমায়িক স্বরে জবাব দেব, না পরেশবাবু, বিয়েতে এসব দেনা-পাওনার ব্যাপারটা আমরা একদম পছন্দ করি না। কোন দাবী-দাওয়াই আমাদের নেই। শাঁখা-সিঁদুরের বেশি আর কিছু চাই না আমরা।

তৃপ্ত মনে, দীপ্ত মুখে পরেশ ও প্রতিমা বাড়ি ফিরে আসেন। হ্যাঁ, এতদিনে একটা সত্যিকারের ভদ্র পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে চলেছেন তাঁরা। এমন একটি সুপাত্র, অথচ দাবী-দাওয়া কিছুই নেই। এ যেন কল্পনাই করা যায় না।

কথাটা পরেশ রায়ের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই তারা বলাবলি করে, পরেশ রায়কে ভাগ্যবানই বলতে হবে। এত কাণ্ডের পরে একটি ভালো পরিবারেই মেয়ে দিতে চলেছে।

একদিন কথায় কথায় প্রতিমা তাঁর স্বামীকে বললেন, দেখ বাপু, ওরা কিছু চায়নি বলে তুমি যেন আবার হাতগুটিয়ে বসো না। ওরা ভদ্রলোক বলে কিছু চায়নি, তাই বলে আমরা যেমন-তেমন করে বিয়ে দিয়ে তো ছোটলোক হতে পারি না।

—তুমি পাগল হলে নাকি? হেসে বলে ওঠেন পরেশ, আমার একটা সামাজিক মান-মর্যাদা আছে না? তুমি দেখে নিও, তোমার বড়-মেয়ের বিয়েতে যা খরচ করেছি জতুর বেলায় তার চাইতে বেশিই খরচ করবো। পাত্রপক্ষ দাবী-দাওয়া না করলে যে পাত্রী পক্ষের দায়িত্ব বেড়ে যায় তা' কি আমি জানিনা মনে করেছ? মানিকতলার সেই চশমখোর লোকটা যদি পণের জন্যে অমন চাপাচাপি করে আমাকে অপমান না করতো তা'হলে তো ওখানেই মেয়ের বিয়ে দিতাম। যাক্‌গে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। ভাগ্য ভালো যে ঐ বাড়িতে জতুকে যেতে হয়নি। পাত্র হিসেবে এটি তো সেটির চাইতে কোন অংশেই খাটো নয়, কি বলো গিন্নী? কথার শেষে আনন্দের আতিশয্যে পরেশ প্রতিমার পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিতেই প্রতিমা একটু সরে বসে কৃত্রিম ধমক দেয় পরেশকে, ওমা, গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? মেয়েরা রয়েছে বাড়িতে।

কোন জবাব না দিয়ে পরেশ কেবল একটু হাসেন।

দু'তরফের বিয়ের আয়োজন চলছে। পরেশের বাড়ি বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রে পাত্রের নাম লেখা হয়েছে, বিষ্ণুকান্ত দেবের পুত্র সঞ্জয় দেব।

বিয়ের দিন কয়েক আগে সাবিত্রী একদিন পরিতোষকে ডেকে হেসে·

বললেন, যে কাণ্ড করছিস তাতে শেষ রক্ষা করতে পারবি তো, পরি ?

জবাব দেয় পরিতোষ, শোন দিদি, কোন কাজে হাত দিয়ে আজ পর্যন্ত তোমার ভাই কখনও বিফল হয়নি, বুঝলে ?

—তা' তো জানি, বললেন সাবিত্রী, আর জানি বলেই সাহস করে তোর মতে মত দিয়েছিলাম। এখন দেখছি তোর জামাইবাবুকে সামলানোই দায় হয়ে উঠেছে।

—কেন, তাঁর আবার কি হলো ?

ম্লান মুখে জবাব দেন সাবিত্রী। তাঁর ধারণা হয়েছে তুই-আমি ভাই-বোন মিলে নাকি তাঁকে ঠকাতে চলেছি। ঐ পাত্রীকে আমার মনে ধরেছিল বলে তুই নাকি কৌশলে তাকে এই বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করেছিস। ভগ্নিপতির সেই অপমানের ব্যাপারটা নাকি তুই গায়েই মাখছিস না।

—ও-এই কথা ? মৃদু হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, জামাইবাবু তো এখন বাড়ি নেই। তুমি তাঁকে বলে দিও দিদি, তার এই শ্যালকটি যা বলে তাই করে। আমি যখন বলেছি অপমানের প্রতিশোধ নেব, তখন নেবই।

ভাইয়ের কথার ওপর আর যেন ভরসা করতে পারেন না সাবিত্রী। বললেন, আর কবে নিবি ? বিয়ের তো আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। সঞ্জু তো পরশুই ছুটি নিয়ে চলে আসছে।

রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দেয় পরিতোষ, তোমরা একটু ধৈর্য ধরো, দিদি। সময়মত সবই হবে। মুখ বুজে কেবল আমার কাজ দেখে যাও।

বিয়ের মাত্র আর দুটো দিন বাকি। ব্যস্ততার অন্ত নেই পরেশের বাড়িতে। ছাদের ওপর ম্যারাপ বাঁধা শুরু হয়েছে। দূরের আত্মীয়-পরিজনেরা একে একে আসতে শুরু করেছে। এদিকে মানিকতলায় মজুমদার সাহেবের বাড়িতে কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানের কোন চিহ্ন নেই এখনও। আসলে এখানে হবে কেবল বৌভাতের অনুষ্ঠান। বর বিয়ে করতে যাবে তার ছোটমামার বাড়ি থেকে।

হঠাৎ পরেশ রায়ের ডাক এলো পরিতোষের কাছ থেকে। জরুরী তলব। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে পরেশ রায় ছুটে এলেন। শত হলেও পাত্রীর বাপ তিনি। ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই তাঁর।

গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পরিতোষ, শুনলাম বরকে যৌতুক দেবেন বলে আপনি নাকি একটা স্কুটার কিনেছেন ?

মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে মৃদু হেসে জবাব দেন পরেশ, ও-এই কথা ? হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ভাবলাম, বম্বের মত সহরে যাতায়াতের জন্যে একটা স্কুটার থাকলে আপনার ভায়ের সুবিধাই হবে। তাই মেয়ের মায়ের আগ্রহেই অল্প

সময়ের মধ্যেই একটা স্কুটার জোগাড় করেছি।

—তা'ছাড়া বিয়েতে দেবেন বলে নাকি একটা রঙিন টি-ভিও কিনেছেন?

সগর্বে হাসি হাসি মুখে জবাব দেন পরেশ রায়, হ্যাঁ তা-ও কিনেছি।

—এছাড়া, আলমারি, খাট-বিছানা ইত্যাদি তো আছেই, কি বলেন?

তেমনিভাবে জবাব দেন পরেশ, তা' তো আছেই। এসব তো একরকম বিয়েরই অঙ্গ। ভালো জিনিসই কিনেছি। গোদরেজের আলমারি—

পরেশের কথার মধ্যেই আবার প্রশ্ন করে পরিতোষ, আর মেয়েকে বোধহয় গয়নাও নেহাত কম দিচ্ছেন না, কেমন?

এতক্ষণে কেমন যেন একটু খটকা লাগে পরেশের। তবে কি যৌতুক হিসেবে কোন বিশেষ বস্তু চাই বলেই পরিতোষ এসব কথা জিজ্ঞেস করছে? নইলে যে লোক যৌতুক হিসেবে একেবারেই কিছু চায় নি, সে বিয়ের এই দু'দিন আগে হঠাৎ এসব জিজ্ঞেস করছে কেন?

পরেশ সরল মনে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের যদি বিশেষ কোন জিনিসের দাবি থাকে তা'হলে বলুন। আমি তা' দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মনে মনে একটু হাসে পরিতোষ। মুখের কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে বেশ মেজাজী স্বরে বললে, আমাদের দাবী মাত্র একটাই।

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন পরেশ। মনে মনে ভাবেন, এও যে দেখছি দাবী আদায়ের এক কৌশল। একটা ঢোক গিলে অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, দাবীর কথা দিন কয়েক আগে বললেই আমাদের সুবিধে হতো। হাতে তো একেবারেই সময় নেই। বলুন, আপনাদের কি দাবী?

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই জবাব দেয় পরিতোষ, দাবী এই যে যৌতুক হিসেবে আপনাদের দেয়া একটি জিনিসও গ্রহণ করতে আমরা অক্ষম। আপনাকে প্রথম দিন যা বলেছিলাম, সেই শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। এমনকি একগাছা চুড়ি পর্যন্ত দিতে পারবেন না মেয়েকে।

পরিতোষের কথায় প্রথমে কেমন যেন ভড়কে যান পরেশ রায়। এ আবার কেমন কথা? কেবলমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে কোন মেয়ের বিয়ে হয় নাকি? ওটা কেবল কথার কথা। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হাসতে চেষ্টা করে আবার বললেন, দেখুন পরিতোষবাবু, আপনি অবশ্যি শাঁখা সিঁদুরের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ যে—

কথাটা শেষ করতে পারেন না পরেশ রায়। তার আগেই বলে ওঠে পরিতোষ, আজ্ঞে না, আমার কাছে শাঁখা-সিঁদুরের অর্থ কেবলমাত্র শাঁখা-সিঁদুর। তার বেশি অন্য কোন বস্তুই নয়।

এবার রীতিমত ঘাবড়ে যান পরেশ। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, এ আপনি কী বললেন, পরিতোষবাবু? আমার একটা সামাজিক মর্যাদা তো আছে। একখানা সাদামাঠা শাড়ি ও একজোড়া শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে আমি কেমন করে আমার মেয়েকে পাত্রস্থ করবো, বলুন?

পরিতোষ বললে, দেখুন, আমার কথার নড়চড় হবে না। আমার ভাগ্নেকে জামাই করতে হলে তাই করতে হবে।

এবার অনুনয় ঝরে পড়ে পরেশের কণ্ঠে। বললেন তিনি, দয়া করে আপনি একবার ভেবে দেখুন, পরিতোষবাবু। এভাবে ভিখিরির মত মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য করে আমার মান-মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দেবেন না।

—মাফ করবেন আমাকে, বলতে থাকে পরিতোষ, দয়া করে আমার প্রিন্সিপ্যালের বাইরে যেতে আমাকে অনুরোধ করবেন না। এককণা যৌতুকও আপনার কাছ থেকে নিতে পারবো না। দেশের আইনের বাইরে যাওয়া অপরাধ।

—আইনের বাইরে? পরেশের কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ, আইনের বাইরে, জবাব দেয় পরিতোষ, জানেন না, এদেশে এন্টি-ডাউরি এ্যাক্ট নামে একটা আইন চালু আছে?

—হ্যাঁ জানি, ভালো করেই জানি, জবাব দেয় পরেশ।

পরিতোষ মনে মনে বললে, আপনি জানবেন না তো কে জানবে? মুখে বললে, ঐ আইনে পণ ও যৌতুক গ্রহণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

পরেশ রায় তাড়াতাড়ি বললেন, সে তো জোর করে আদায় করলে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিজের ইচ্ছেয় দিচ্ছি। আপনি তো কিছুই দাবী করেন নি।

—বাইরের লোকেরা তো তা' জানতে পারছে না, বলতে থাকে পরিতোষ, তারা মনে করবে ভাগ্নের বিয়েতে পাত্রীর বাবার ঘাড় ভেঙে আমি এসব আদায় করেছি। না-না পরেশবাবু, যৌতুক গ্রহণ করতে আমাকে অন্যায় অনুরোধ করবেন না।

পরিতোষের কণ্ঠের দৃঢ়তা বাড়িয়ে তোলে পরেশের মনের বিভ্রান্তি। এভাবে তিনি মেয়ের বিয়েই বা দেবেন কেমন করে, আবার এই শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙে দেবেনই বা কিভাবে?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান পরেশ রায়। পরিতোষের একটা হাত চেপে ধরে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, আপনি,—আপনি আমাকে বাঁচান, পরিতোষবাবু। সবার চোখে আমাকে এভাবে হেয় করবেন না। দয়া করুন। গ্রহণ করুন বা না করুন, বিয়ের আসরে উপস্থিত সবাইকে অন্তত এটুকু বুঝতে

দিন যে বিনে যৌতুকে কেবলমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে পরেশ রায় তার মেয়েকে বিয়ে দেয় নি।

—তার মানে, সবাই বুঝতে পারবে যে আমি ঐসব যৌতুক গ্রহণ করেছি, কেমন?

—তা' অবশ্যি বুঝতে পারবে। মাথা নিচু করে জবাব দেন পরেশ।

—তার মানে, দেশের আইন ভঙ্গ করে আমি আপনার সামাজিক সম্মান বজায় রাখবো। এটাই আপনার ইচ্ছে, কেমন?

পরেশ রায় জবাব না দিয়ে এবার চুপ করে থাকেন।

একটু সময় চিন্তা করে পরিতোষ। তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার ভঙ্গি করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললে, শুনুন পরেশবাবু, আপনি আমার আত্মীয় হতে চলেছেন। আপনার সম্মান হানি করা কোন মতেই আমার উচিত নয়। ঠিক আছে। এন্টি-ডাউরি এ্যাক্ট ভঙ্গ করেই আপনার সম্মান আমি বাঁচাবো। তবে, আইন যখন ভাঙবো তখন পুরোপুরিই ভাঙবো। আপনার দেয়া যৌতুক সবই গ্রহণ করবো। তবে সেই সঙ্গে কিছু পণের টাকাও চাইবো।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন পরেশ রায়। এতক্ষণে যেন তাঁর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। তাড়াতাড়ি বললেন, বেশ তো, কত টাকা চাই আপনার?

অম্লান বদনে জবাব দেয় পরিতোষ, বেশি নয়। আপনার দেয়া যৌতুকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হাজার পঁচিশেক হলেই চলবে।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দেন পরেশ, ঠিক আছে। তাই হবে। কাল সকালেই আমি টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

সেই মুহূর্তে পরেশ রায়ের মানিকতলার মজুমদার সাহেবকে মনে পড়েছিল কিনা তার খবর একমাত্র তিনিই জানেন।

দশ

বিয়ে বাড়িতে বরের আসর ঘিরে কৌতূহলী মেয়েদের ভিড়। বরের চেহারায় মুগ্ধ প্রবীণারা। আর নবীনাদের মনে প্রকাশ-রহিত বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। বরযাত্রীরা সবাই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

ভিড়ের মধ্যে রীনার দিকে চোখ পড়তেই সঞ্জয়ের ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। জবাবে রীনার মুখেও তেমনি হাসি জেগে ওঠে। পাচ্ছে ঐ বিচ্ছু মেয়েটা আসরের মধ্যে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে সেই আশঙ্কায় সঞ্জয় তাড়াতাড়ি রীনার ওপর থেকে সরিয়ে নেয় নিজের চোখজোড়া।

বরের আসরে বাইরের একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল পরিতোষ। হঠাৎ সেখানে আবির্ভাব ঘটে রীনার। মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস করে পরিতোষকে, কি দাদা, শেষরক্ষা কি করে করবেন তা' ভাবতে গিয়েই বুঝি বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছেন?

হাতের সিগারেটে একটা জোর-টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পরিতোষ মৃদু হেসে নিচু কণ্ঠে বললে, ঠিক্ ধরেছিস্, কোন্ পদ্ধতিতে তুই মেরু এক করবো তা-ই ভাবছি।

একটু থেমে রীনার আর একটু কাছে সরে এসে পরিতোষ জিজ্ঞেস করে, জয়ন্তীর বাবা কোথায় রে?

—ওদিকেই তো একটু আগে দেখেছিলাম মেসোমশাইকে। জবাব দেয় রীনা।

—শোন্, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ? রীনা তাকিয়ে থাকে পরিতোষের মুখের দিকে।

মুখটিপে হেসে পরিতোষ জবাব দেয়, তোর মেসোমশাইয়ের কানে কোনরকমে এই কথাটা তুলে দিবি যে বরযাত্রীদের সঙ্গে নাকি বরের বাবাও এসেছেন। ব্যাস, তোকে আর কিছু করতে হবে না। কথাটা বলেই তুই সরে পড়বি সেখান থেকে।

—তারপর?

—তারপর যা করার আমি করবো।

একটু পরেই পরিতোষের খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হন্ পরেশ। পরিতোষ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই বলে ওঠেন পরেশ, শুনলাম বাংলাদেশ থেকে নাকি বরের বাবাও এসেছেন?

পরিতোষ ঘাড় নাড়ে।

—সেকি মশাই? বলতে থাকেন পরেশ, এতক্ষণ এই কথাটা আপনি বলেন নি আমাকে? কোথায় তিনি? বরের বাপ বলে কথা! চলুন—চলুন, পরিচয় করিয়ে দিন আমার সঙ্গে। ছি—ছি, হয়তো ঠিকমত অভ্যর্থনাই করা হয়নি তাঁকে। আমার সম্পর্কে হয়তো কি ভাবছেন তিনি!

—না—না, কিছুই ভাবছেন না। বলতে বলতে পরিতোষ পরেশকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত দূরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা একখানা গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই বলে ওঠেন পরেশ, ওদিকে কি?

জবাবে পরিতোষ বললে, ঐ গাড়ির মধ্যেই তো রয়েছেন তিনি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে উনি গাড়ি থেকে নামতে চাইছেন না।

—ছি—ছি, কি লজ্জা! কথাটা আগে বলবেন তো আমাকে। বলতে-বলতে পরেশ গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলতে থাকেন, আসুন—আসুন, বেয়াই মশাই। এতক্ষণ আমাকে কেউ আপনার কথা বলেইনি। আসুন—দয়া করে নেমে আসুন।

প্রথমে গাড়ির খোলা দরজায় দেখা দেয় সুদৃশ্য ছড়িসহ একখানি হাত। পরেশ তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে সেই হাতের ওপর আলতোভাবে নিজের হাতখানা রাখতেই ছড়িসহ হাতের মালিক গাড়ি থেকে নেমে আসেন। আর সেই দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকেন পরেশ। মুখে আর একটি কথাও জোগায় না তাঁর।

দুই বেয়াই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পরেশ ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন পরিতোষকে, ইনি এখানে কেন পরিতোষবাবু?

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয় পরিতোষ, আপনার সঙ্গে এই চাতুরিটুকু করতে হয়েছে বলে আমাকে মাপ করবেন পরেশবাবু। উনিই আপনার বৈবাহিক অর্থাৎ আপনার হবু জামাতা বাবাজীর বাবা।

—বলছেন কি? স্খলিত কণ্ঠস্বর পরেশের, চাতুরি করতে গিয়ে শেষে নিজের ভগ্নিপতির নাম-ধামও পাল্টে দিলেন, মশাই? ওঁর নাম তো বি, কে, মজুমদার। আর চিঠিতে ছাপিয়েছেন বিষ্ণুকান্ত দেব।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জবাব দেয় পরিতোষ, দুটোই ঠিক। বি. কে. মানেই বিষ্ণুকান্ত। আর টাইটেলের কথা বলছেন? ওঁদের টাইটেল দেব মজুমদার। তাই, জোড়া টাইটেলের যে কোন একটা লিখলেই কাজ চলে।

মজুমদার সাহেব এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। পরিতোষ থামতেই তিনি পরেশকে বললেন, শুনুন বেয়াইমশাই, আমি যতই কেননা খারাপ লোক হই, আমার ছেলে অর্থাৎ আপনার হবু জামাতা বাবাজী কিন্তু বাস্তবিকই একটি ভালো ছেলে।

গভীর প্রত্যয়ের সুরে জবাব দেন পরেশ, তা' আমি জানি। আর জানি বলেই এই সেদিন পর্যন্ত আপনার ছেলের জন্যে আমার স্ত্রীর আক্ষেপের অন্ত ছিল না।

—তবে, সর্বসুলক্ষণা আপনার কন্যাটিকেও কিন্তু আমাদের বিশেষ পছন্দ হয়েছিল। বললেন মজুমদার সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে টিপ্পনি কাটে পরিতোষ, তা' আর হবে না? পাত্র-পাত্রী যে একেবারে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট রাজযোটক।

বিয়ের আসর থেকে একটু তফাতে পাশাপাশি বসে পরেশ রায় ও মজুমদার সাহেব। পেছনে আর একটা চেয়ারে পরিতোষ। লজ্জিত কণ্ঠে পরেশ বললেন, বাস্তবিক বেয়াইমশাই, এখন খুবই লজ্জা করছে আমার। সেদিন মাত্র কয়েকটা টাকার জন্যে এ্যান্টি-ডাউরি এ্যাক্টে আপনাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে কতই না নাজেহাল করেছি।

—না—না, আর কোন লজ্জা নেই, বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, সব তো শোধবোধ হয়ে গেছে। আমাকে আদালতে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দিয়ে আপনি নিজের জেদ বজায় রেখেছেন, আর আমিও আমার জেদ বজায় রেখেছি কৌশলে আপনার কাছ থেকে সঠিক সেই পঁচিশ হাজারই আদায় করে। ব্যাস, এর পর আর কী থাকতে পারে?

—ঠিক, পেছন থেকে আবার টিপ্পনী কাটে পরিতোষ, পরেশবাবু ঢাললেন এ্যাসিড আর জামাইবাবুর হয়ে আমি তাতে দিলাম এ্যালকালি। গোটা ব্যাপারটাই নিউট্রালাইজ হয়ে গেল।

পরিতোষের কথায় মজুমদার সাহেব ও পরেশ রায় দু'জনেই সশব্দে হেসে ওঠেন। মজুমদার সাহেব পরেশের হাতে হাত রেখে হাসতে হাসতে আবার বললেন, তা'হলে বেয়াইমশাই, পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের সমান পয়েন্ট, কেমন?

সহসা পেছনে জেগে ওঠে রীনার কণ্ঠস্বর, ওয়ান-ওয়ান ড্র।

* * *

এই কাহিনীর একটু পরিশিষ্টও আছে। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' কথাটা চমৎকার। বিশেষ করে বিয়ে-শাদীর মত আনন্দ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই কথাটির তাৎপর্য অতুলনীয়। তবে মধু শব্দটির আগে যদি 'যষ্টি' অর্থাৎ 'লাঠি' শব্দটি বসানো যায় তা'হলে বোধহয় ব্যাপারটি তেমন মধুময় হয়ে ওঠে না। 'যষ্টিমধুরেণ সমাপয়েৎ' কথাটির দিকে স্বাভাবিক কারণেই অনেকে সন্দেহের চোখে তাকাবেন।

ছোটমামার বুদ্ধির ওপর ভর করে সঞ্জয় ও জয়ন্তী এরপরে নির্বঞ্ঝাটেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। চারিদিকেই খুশির পরিবেশ শোধবোধের কথা মাথায় রেখে দুই বেয়াইও দারুণ খুশি।

বৌভাতের বিরাট আয়োজন মজুমদার সাহেবের বাড়িতে। আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের ভিড়ে বাড়িটা গমগম করছে। ছাদের ওপর বিরাট প্যাণ্ডেলে চলছে খাওয়া-দাওয়া। সুবেশ-সুবেশারা দলে দলে যাচ্ছে আসছে।

ঠিক এমনি সময় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় একজন পুলিশ অফিসার। সঙ্গে দু'জন লাঠিধারী কনস্টেবল।

বাড়ির মালিকের খোঁজ করতেই বাইরে বেরিয়ে আসেন মজুমদার সাহেব। পুলিশ দেখেই বুকটা তাঁর কেঁপে ওঠে। আসলে সেই মামলার পর থেকেই আদালত ও পুলিশ সম্পর্কে তাঁর ভীতি বেড়ে উঠেছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করে, আপনার নামই বিষ্ণুকান্ত দেব?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মজুমদার সাহেব বলেন, দেবমজুমদার।

—আপনার ছেলের বিয়ের আজ বৌ-ভাত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কম্পিত কণ্ঠস্বর মজুমদার সাহেবের।

—আপনার নামে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে।

—আবার অভিযোগ! মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে মজুমদার সাহেবের। খবর পেয়ে পরিতোষ ছুটে এসে সেই মুহূর্তে তাঁকে ধরে না ফেললে তিনি হয়তো পড়েই যেতেন।

বিয়ে বাড়িতে পুলিশ। এক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে যেন এক মূর্তিমান অসুন্দর। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত। অস্বস্তিকর অথচ চাপা এক চাঞ্চল্য জেগে ওঠে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। ম্লান হয়ে ওঠে বৌ-ভাতের আনন্দ।

মজুমদার সাহেব ও পরিতোষকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ অফিসার বললে, আমি এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ থেকে এসেছি। একটা অপ্রিয় কাজের ভার পড়েছে আমার ওপর।

কথা বলতে বলতে পুলিশ অফিসারটি পরিতোষের হাতের দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করে আবার বলতে থাকে, আর বলেন কেন। মানুষের অপ্রিয় কাজ করতে করতে এই চাকরির ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছে। এই দেখুন না, সুন্দর বৌ-ভাতের অনুষ্ঠান। কত আনন্দ চারিদিকে। কিন্তু এমন একটা কাজ করতেই এখানে আসতে হয়েছে যে এই মুহূর্তে গোটা আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে।

—বলছেন কি? আর একবার কেঁপে ওঠেন মজুমদার সাহেব। চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পরিতোষ, বলুন তো, কি হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলতে থাকে পুলিশ অফিসার, অভিযোগের কথা তো বলতেই হবে। শুনুন বিষ্ণুকান্তবাবু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেস্ট্‌ কণ্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। আপনি নাকি সেই বিধি ভঙ্গ করেছেন।

—মিথ্যে কথা। বেশ জোরের সঙ্গেই বলে ওঠেন মজুমদার সাহেব, নিমন্ত্রণপত্রের মধ্যে স্পষ্ট করেই ছাপা রয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রযোজ্য।

—কেবল ছাপা থাকলেই কি চলবে? জিজ্ঞেস করে পুলিশ অফিসার।

মজুমদার সাহেবের বদলে এবার জবাব দেয় পরিতোষ, আমরা তো জানি ঐ কথাগুলো কেবলমাত্র বিয়ের চিঠিতে ছাপা থাকলেই নাকি চলে। মেনে চলার নাকি দরকার হয় না।

—হ্যাঁ চলে, বলতে থাকে পুলিশ অফিসার, যদি না আমাদের কাছে কোন অভিযোগ আসে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে যে বিষ্ণুকান্তবাবু নাকি পাঁচ ছ'শো লোকের খাওয়ার আয়োজন করেছেন। কেবল তাই নয়, খাদ্য তালিকায় নাকি চাল ও গমের তৈরি খাদ্যও আছে। এ সবই বে-আইনী।

স্খলিত কণ্ঠে মজুমদার সাহেব বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন, এতসব আমরা কিন্তু একেবারেই জানতাম না।

—রাইট! ঠিকই বলেছেন আপনি, বলে ওঠে পুলিশ অফিসার, এতসব ক'জনেই বা জানে? কিন্তু মুশকিল কি জানেন, ইগ্‌নোরেন্স অফ্‌ ল ইজ নো এক্সকিউজ—জানি না বলে কিন্তু আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

কেবল মজুমদার সাহেবের নয়, এতক্ষণে পরিতোষের মত মানুষের মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ অফিসারটি বলতে থাকে, ডোণ্ট ওরি—চিন্তা করবেন না। আপনাদের এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যাতে খুব একটা বাধা না পড়ে তেমন ভাবেই আমি কাজ করবো। যেখানে আপনাদের রান্নাবান্না হচ্ছে সেখানে একবার যাবো। ঠাকুর-চাকরদের কাছ থেকে নিমন্ত্রিতের সঠিক সংখ্যাটা কেবল জেনে নেবো। অবশ্যি খাবারের পরিমাণ থেকেই মোটামুটি সেটা বোঝা যাবে। আর ঐ সঙ্গে তৈরি খাবারের কিছু স্যাম্পল নিয়ে আপাততঃ এখানকার কাজ শেষ করবো।

—তারপর? মজুমদার সাহেব বিস্ফারিত চোখে তাকান পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে।

যেন তেমন কিছু হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে জবাব দেয় অফিসার, তারপরে প্রোসিকিউশন। গেস্ট কণ্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা। না—না, এ জাতীয় মামলায় আপনাকে বেশিদিন কোর্ট-কাছারি করতে হবে না। জেল—জরিমানা যা হবার তা' খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

—আবার মামলা? অসহায় কণ্ঠস্বর মজুমদার সাহেবের, একবার এ্যাণ্টি-ডাউরি এ্যাক্টে মামলা, আবার গেস্ট কণ্ট্রোল অর্ডারে মামলা। হায় ভগবান। ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে শেষে কি কেবল মামলা-মোকর্দ্দমা করেই মরতে হবে!

মজুমদার সাহেবকে এবার একরকম ধমকেই ওঠে পরিতোষ, আপনি একটু চুপ করুন তো, জামাইবাবু। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল হায়—

হায় করবেন না। যা করার আমিই করছি।

—তুমি আর কি করবে? তবুও থামতে চান না মজুমদার সাহেব। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে থাকেন, অদৃষ্ট—বুঝলে পরিতোষ, এ সবই আমার অদৃষ্ট।

—না জামাইবাবু, বিপদের মধ্যেও রসিকতা ছাড়ে না পরিতোষ, এ সবই হচ্ছে পাত্র-পাত্রীর সেই রাজযোটকের ফল।

ঠিক্ এমনি সময় রীনাকে সেখানে দেখতে পেয়ে পুলিশ আফিসারটি বলে ওঠে, আরে রীনা যে! তুমি এখানে?

—ও-আপনি? মৃদু হেসে জবাব দেয় রীনা, আমার বান্ধবীর বৌ-ভাতে কনেযাত্রী হয়ে এসেছি। এসেই শুনলাম, কি নাকি সব পুলিশি হাঙ্গামা বেধেছে।

—না—না, হাঙ্গামা কিছু নয়, বলে ওঠে অফিসার, সামান্য একটু কাজ। এটুকু সেরেই চলে যাবো এখান থেকে।

এতক্ষণে যেন একটা পথের সন্ধান পায় পরিতোষ। জিজ্ঞেস করে রীনাকে, তুই এ কে চিনিস্ নাকি?

—বারে, বলে ওঠে রীনা, ও কে চিনবো না? বাবার বন্ধু যে। পোশাকের আড়ালে হঠাৎ চিনতে পারিনি। কথাটা বলেই রীনা আফিসারটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

ততক্ষণে তাদের চারিদিকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। চোখে-মুখে তাদের কৌতূহল মেশানো উৎকণ্ঠা। অনেকেরই খাওয়া-দাওয়া হয়নি তখনও।

এতক্ষণে কাজে নেমে পড়ে পরিতোষ। ভিড সরিয়ে পুলিশ অফিসার ও মজুমদার সাহেবকে নিয়ে সে ঢোকে একটা ফাঁকা ঘরে। সঙ্গে রীনা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে যখন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন মজুমদার সাহেবের মুখে চিন্তা-ভাবনার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। পুলিশ অফিসারটিও বেশ খোসমেজাজে। আর, পরিতোষ ও রীনার মুখেও হাসি।

চা-মিষ্টি খেয়ে পুলিশ অফিসার ও কন্‌স্টেবলরা চলে যেতেই মজুমদার সাহেব রীনার পিঠে হাত রেখে বললেন, পয়সার জন্যে দুঃখ করছি না মা। কিন্তু আজ তুমি না থাকলে হয়তো পয়সা খরচ করেও পার পেতাম না। কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে বোধহয় আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ।

কোন জবাব না দিয়ে রীনা কেবল মৃদু হাসে।

মজুমদার সাহেবের বাড়িতে বৌ-ভাতের আনন্দ আবার ফিরে এসেছে। এতক্ষণ থেমে থাকা মাইকে আবার শুরু হয়েছে হেমন্তর রবীন্দ্র সঙ্গীত। ছাদের ওপর পরিবেশনকারীদের ব্যস্ততা। একতলায় খাওয়া দাওয়ার পরে সুবেশ ও সুবেশাদের বাড়ি ফেরার তাড়া।

কন্যাযাত্রীদের খাওয়া দাওয়াও শেষ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লাক্সারী বাস বোঝাই হয়ে এবার তারা ফিরে যাবে।

পরেশ রায় পান চিবোতে চিবোতে মজুমদার সাহেবের হাত ধরে হেসে বললেন, খুবই খুশি হয়েছি আপনাদের ব্যবহারে। আরও বেশি খুশি হয়েছি পণের ব্যাপারে আমার দাবী শেষ পর্যন্ত আপনারা মেনে নিয়েছেন বলে।

—তার মানে? মজুমদার সাহেব ভ্রু-কুঁচকে তাকান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শ্যালক পরিতোষের দিকে।

পরিতোষ নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, আপনার কথাটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, পরেশবাবু।

তেমনি হাসতে হাসতে পরেশ আবার বললেন, এই যে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমার কাছ থেকে পনেরো হাজার টাকা পণ নিলেন, এটা যদি আগে নিতেন তা'হলে কি আর সেই বিশ্রী মামলা-মোকর্দ্দমা হতো? যাক্ গে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। কি বলেন, বেয়াইমশাই?

মজুমদার সাহেব ও পরিতোষের চোখ-মুখের বিস্ময় সেই মুহূর্তে আরও কয়েকগুণ বেড়ে ওঠে। বলে ওঠে পরিতোষ, আপনি বলছেন কি, পরেশবাবু? জামাইবাবুর ইচ্ছেমত আপনার কাছ থেকে তো আমি নগদ পঁচিশ হাজার টাকাই নিয়েছি। অবশ্যি, একটু কৌশলে।

রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দেন পরেশ রায়, তা'ঠিক্। তবে তার মধ্যে তো আপনারা আবার আমাকে দশ হাজার ফেরত দিয়েছেন।

—কবে? কখন? একযোগে প্রশ্ন করেন মজুমদার সাহেব ও পরিতোষ।

—এই তো, কিছুক্ষণ আগে। জবাব দেন পরেশ, তবে এটাও একটু কৌশলে।

—তার মানে?

—অতি সরল বেয়াইমশাই, বলতে থাকেন পরেশ রায়, একটু আগে যে দশ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা ঐ পুলিশ অফিসারকে দিতে হবে বলে রীনা আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছে সেটা আমার কাছেই ফিরে এসেছে। ঐ পুলিশ অফিসার আমারই ভাইপো সমর।